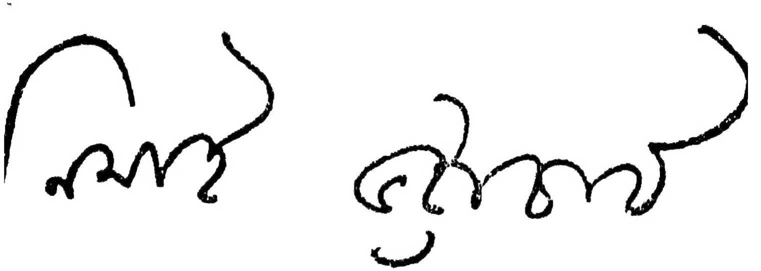

উর্বশী
নিমাই ভট্টাচার্য

উর্বশী

উর্বশী



বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড : কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ

বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়

৫৪, ঠাকুর পাড়া রোড (নৈহাটী)

২৪ পরগণা

প্রথম প্রকাশ ঃ

জানুয়ারী ঃ ১৯৫৮

প্রচ্ছদ ঃ

সুবোধ দাশগুপ্ত

মুদ্রাকর ঃ

নারায়ণ চন্দ্র পাল

বাণী মালা প্রেস

৩৬, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৯

এক

আগের দু'বছরের মত সেবারও আমি যথারীতি ডালহৌসী সার্কিট হাউসে হাজির। আমাকে দেখেই কেয়ার টেকার-কাম-চৌকিদার মঙ্গল সিং এক গাল হাসি হেসে সেলাম দিয়ে বলল, সাব, আপনার কামরা তৈরি করে রেখেছি।

একটু হেসে বলি, আবার সেই দু'নম্বর কামরা নাকি?

—না, না, সাব। আপনার জন্য এক নম্বর কামরাই রেখেছি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, গত বছর গলতি হয়েছিল। এবার আর সে গলতি করিনি।

ডালহৌসীর আদি সার্কিট হাউসটি কাঠের দোতলা বাড়ি। দুটি শোবার ঘরই দোতলায়। এক তলার দুটি ঘরের একটি ড্রইংরুম, অন্যটি ডাইনিং রুম। দোতলার এক নম্বর ঘর থেকে দূরের চিরতুষারাবৃত হিমালয়ের ধৌলাধার পর্বত দেখা যায় বলেই ঐ ঘরটি আমার বিশেষ পছন্দ।

মঙ্গল সিং আমার সুটকেশ আর ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে যায়। আমি ওর পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠে এক নম্বর ঘরে পা দিতে গিয়েই খেয়াল হলো, দু'নম্বর ঘরের দরজায় তালা নেই। ঘরে ঢুকেই মঙ্গল সিং'কে জিজ্ঞেস করলাম, দু'নম্বর ঘরে কি কোন গেস্ট আছেন?

—হা সাব! ও ঘরে এক মেমসাব আছেন।

ও আমার মালপত্র রেখেই বলে, আপনি তো দিনরাত্তির ঘরে বসে শুধু কাহানী লিখবেন। ও ঘরের গেস্টের জন্য আপনার কোন অসুবিধে হবে না। ঐ মেমসাবও সারাদিন শুয়ে-বসে পড়াশুনা করেন। মাঝে মধ্যে একটু বেড়াতে যান।

আমি বাথরুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে বেরুতে না বেরুতে মঙ্গল সিং চা দেয়।

আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতেই ও জিজ্ঞেস করে, সাব, নাস্তা আধ ঘণ্টা পরে দেব?

—হ্যাঁ, দিও।

সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করি, তোমার স্ত্রী আর মেয়ে ভালো আছে তো?

ও এক গাল হাসি হেসে বলে, হাঁ সাব, ভাল আছে। আপনি আসছেন শুনে ওরা দু'জনেই খুব খুশি।

—বিকেলবেলায় তোমার মেয়েকে পাঠিয়ে দিও।

মঙ্গল সিং আবার হাসে। বলে, ও নিজেই আসবে। আমাকে কিছু বলতে হবে না।

মঙ্গল সিং রাজপুত। ওদের আদি বাস ছিল রাজস্থানের রণকপুরের কাছে। ওর ঠাকুর্দা বীরভদ্র সিং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির রাজপুত রেজিমেন্টের সদস্য হয়ে মেসোপটেমিয়া গিয়েছিল। ওর ছেলেও সেনাবাহিনীতে ছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর মেজর হ্যারিসনের সুপারিশে এই সার্কিট হাউসের কেয়ার টেকার-কাম-চৌকিদার হয়। তারই ছেলে মঙ্গল সিং।

মঙ্গল সিং কোনদিন সেনাবাহিনীতে না থাকলেও সৈনিকদের মতই নিষ্ঠাবান, দায়িত্বশীল, কর্তব্যপরায়ণ। তাছাড়া কোন ব্যাপারেই না বলতে জানে না। ওর স্ত্রী সাবিত্রী সুশিক্ষিতা না হলেও সুগৃহিণী ও রন্ধনে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী। ওদের মেয়ে শীলা যখন পাঁচ বছরের, তখন ওকে আমি প্রথম দেখি। শীলার সঙ্গে আমার দারুণ বন্ধুত্ব। ঐ মেয়েটাও আমাকে খুব পছন্দ করে।

এখানে এলে আমি সারাদিন লিখি। তারপর সন্ধের দিকে শীলাকে নিয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য বেড়াতে যাই। যেতেই হবে। শুধু তাই না। প্রতিদিন ওকে গল্পও শোনাতে হবে।

সত্যি কথা বলতে কি, শুধু শান্তিতে লেখাপড়া করার জন্যই না, এই ছোট্ট শীলার আকর্ষণেও আমাকে ডালহৌসী আসতে হয়।

যদি কোনদিন কোন কারণে বিকেল-সন্ধের দিকে ওকে সান্নিধ্য না দিতে

পারি, তাহলে রাত্তিরবেলায় ঘুমুতে যাবার আগে ও আমার কাছে ছুটে আসবে। চোখ দুটো বড় বড় করে বলবে, বাবুজি, আজ তো কাহানী নেই শুনায়া!

—সর্বনাশ! আজ তোমাকে গল্প বলিনি?

—নেই বাবুজি।

বিছানায় হেলান দিয়ে বসে ওকে কাছে টেনে নিয়ে গল্প বলতে শুরু করি কিন্তু গল্প শেষ হবার আগেই শীলা আমার বুকের উপর ঘুমিয়ে পড়ে। সে রাত্রে শীলা আমার কাছেই ঘুমোয়।

যাইহোক, সেদিন সন্ধের পর শীলাকে নিয়ে সুভাষ চক থেকে ফিরে আসার একটু পরই মঙ্গল সিং আমার ঘরে এসে বলে, সাব, দু'নম্বরের মেমসাব আপনাকে ওর ঘরে যেতে বললেন।

আমি একটু বিরক্ত হয়েই বলি, যে মেমসাহেবকে আমি চিনি না, জানি না, তাঁর ঘরে যাবো কেন?

—ও মেমসাবও বাংগালী আছেন।

আমি একটু হেসে বলি, আমি বাঙ্গালী বলে কি সব বাঙ্গালী মেয়েদেরই চিনি?

মঙ্গল সিং চলে যায় কিন্তু দু'এক মিনিট পরই আবার আসে। বলে, মেমসাব আবার বললেন, আপনাকে যেতে।

ভদ্রমহিলা কেন আমাকে ডাকছেন ভেবে অবাক হই। জিজ্ঞেস করি, ভদ্রমহিলা কি এম.পি বা এম.এল.এ.?

—সাব, তা তো জানি না। তবে পশ্চিম বাংগালের একজন মন্ত্রী ওর রিজার্ভেশন করেছেন। মনে হয়, কোন মামুলি আওরাত না।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আকাশ-পাতাল চিন্তা করি। একবার মনে হয়, উনি বোধহয় আমাকে চেনেন ও জানেন। তা না হলে বার বার আমাকে ডেকে পাঠাবেন কেন। আবার মনে হয়, সাংবাদিকতা করার জন্য আমিও তো বহু মহিলাকে চিনি জানি। উনি সেইরকমই একজন হতে পারেন। তবু ওর ঘরে যেতে দ্বিধা হয়। নেহাত সৌজন্যের খাতিরে ওঁর নিজে এসেই তো

আমাকে ওঁর ঘরে যাবার কথা বলা উচিত ছিল।

মঙ্গল সিং বলে, সাব, একবার ঘুরে আসুন না! যদি ভাল না লাগে তাহলে চলে আসবেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়াই। বলি, চলো ; দেখে আসি।

মঙ্গল সিং দু'নম্বর ঘরের দরজায় নক্ করতেই মহিলা বেশ মিহি গলায় বলেন, প্লীজ কাম ইন।

আমি দরজা খুলে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই এক গাল হেসে প্রায় চিৎকার করে উঠি, মাই গড! উর্বশী, তুমি?

যে হাসি, যে চোখের বিদ্যুত লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে মাতাল করে দেয়, সেই চাহনি সেই হাসি হেসে বলল, তুমি আমাকে উর্বশী নাম দিয়েছ বলেই তোমাকে এত বেশি ভালবাসি।

আমি ওর মুখোমুখি বসে একটু হেসে বলি, কেন মিথ্যে কথা বলছো? তুমি তো জীবনে কাউকে ভালবাসো নি, ভালবাসতে চাওনি, ভালবাসতে পারবেও না।

উর্বশী বেনসন-হেজেসের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে আমাকে দেয়, নিজেও ধরায়।

আমি সিগারেটে একটা টান দিয়েই বলি, পৌরাণিক যুগের উর্বশী রূপলাবণ্য দেখিয়ে স্বর্গরাজ্য তোলপাড় করেছিলেন। আর তুমি বাংলা সিনেমায় নিজের রূপ-যৌবন আর ঢল ঢল ভাব দেখিয়ে কত পুরুষের সর্বনাশ করলে বলো তো?

উর্বশী একটু ম্লান হাসি হেসে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দেখো বাচ্চু, যেসব পিপীলিকাদের পাখনা গজায়, তারা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরে। মরবেই। ওদের মৃত্যুর জন্য আগুনকে দোষী করা কি ঠিক?

ও কথাটা শেষ করেই প্রায় লাফ দিয়ে ওঠে। আলমারী থেকে স্কচের বোতল বের করে দুটো গেলাসে ঢালে। জল দেয়। আমার হাতে একটা গেলাস তুলে দিয়েই নিজের গেলাস ঠোটের কাছে নিয়েই বলে, চিয়ার্স!

—চিয়ার্স!

হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়েই উর্বশী জিজ্ঞেস করে, তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছ?

—না, না, বেড়াতে আসিনি। এসেছি পূজা সংখ্যার উপন্যাস লিখতে।

—সত্যি লিখতে এসেছ?

—হ্যাঁ, সত্যি লিখতে এসেছি।

ও হুইস্কির গেলাসে আবার চুমুক দিয়ে একটু হেসে বলল, আমাকে নিয়ে লেখো।

আমি অবাক হয়ে বলি, তোমাকে নিয়ে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে।

ও সিগারেট ধরিয়ে মাত্র একটা টান দিয়েই অ্যাসট্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলে, হ্যাঁ, বাচ্চু, আমাকে নিয়ে লেখো। আমি তোমাকে সব বলব।

আমি হাসতে হাসতে বলি, তুমি সব কথা বলবে, তাই কখনো হয়?

—হ্যাঁ, সত্যি সব কিছু তোমাকে বলব।

উর্বশী হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিতে গিয়েও নামিয়ে রেখে বলে, সব মানুষই নিজের সুখ-দুঃখের কথা কাউকে না কাউকে বলতে চায়। বলে হালকা হতে চায়।

—নিশ্চয়ই চায় কিন্তু তুমি তো অভিনেত্রী! তুমি তো সাধারণ মানুষ না।

আমি না থেমেই বলে যাই, যে সুখ-দুঃখ প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা সাধারণ মানুষের জীবনের মূল কথা, তোমার কাছে তো তার কোন দাম নেই বলেই মনে হয়।

—বোধহয় তুমি ঠিকই বলছো কিন্তু তবু নিজের কথা কোন একজন মানুষকে বলতে ইচ্ছে করে।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, বাচ্চু, তুমি বিশ্বাস করো, তোমাকে আমার সব কথা বলতে কোন দ্বিধা নেই।

আমি একটু চাপা হাসি হেসে বলি, তোমাকে নিয়ে যে কত লেখা হয়েছে, তার তো সীমা নেই। সব সাংবাদিক-লেখকই তো দাবী করেন, সব সত্যি কথা কিন্তু আমি যতটুকু তোমাকে চিনেছি বা জেনেছি, তাতে তো মনে হয়, তুমি কাউকে কোনদিন নিজের ব্যাপারে সত্যি কথা বলো নি।

—না, বলিনি।

—তুমি মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করতে করতে নিজেই মিথ্যা হয়ে গিয়েছ। তুমি সত্যি কথা বলতে ভুলে গেছ।

ও একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, বাচ্চু, তুমি জার্নালিস্ট। পার্লামেন্টে যা ঘটে, তুমি তাই লেখো ; প্রেসিডেন্ট-প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেশে-বিদেশে গিয়ে ওদের কথা লেখো। তুমি মিথ্যে কথা কাগজে লিখতে পারো না।

আমি হুইস্কী খেতে খেতে ওর কথা শুনি।

—আর আমরা যারা সিনেমায় অভিনয় করি, তারা যদি সত্যি কথা বলি, তাহলে কত সংসারে আগুন জ্বলবে, তার ঠিকঠিকানা নেই।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, সত্যি কথা বললে হয় আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে, নয়তো কেউ না কেউ আমাকে খুন করে ফেলবে।

তবু আমি চুপ করে থাকি।

উর্বশী একটু হেসে বলে, যে যত ভাল মুখোশ পরে থাকতে পারে, সিনেমা লাইনে তার তত বেশি উন্নতি হবে।

—সেই মুখোশ পরেই তো তুমি আমাকে তোমার কথা বলবে।

—না।

—যে মুখোশ পরে তুমি লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীর মন জয় করেছ, সেই মুখোশ কি তুমি কোনদিন খুলতে পারবে?

ও অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে বলে, যে স্বার্থপর, ঈর্ষা পরায়ণ, অর্থ, খ্যাতি আর কামনা-বাসনা-লালসা ভরা সিনেমা জগতে আমি আছি, সেখানে কখনই আমি মুখোশ খুলতে পারবো না।

উর্বশী আবার গেলাসে হুইস্কী ঢালতে ঢালতে বলে, কিন্তু তুমি তো ঐ জগতের মানুষ না। তোমার-আমার মধ্যে তো কোন স্বার্থের সম্পর্ক নেই। তাই তোমাকে আমার চরম গোপন কথা বলতেও দ্বিধা নেই।

আমি একটু হেসে বলি, তোমাকে নিয়ে লেখার পর তো নানা সংসারে আগুন জ্বলে উঠবে। তখন...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও একটু হেসে বলে, নাম-ধাম পাল্টে দিও। তাহলে কোন সংসারে আগুন তো জ্বলবেই না, বরং তোমার

উপন্যাস পড়ে ওরা খুশিই হবে।

—আর তুমি?

—পুরুষদের দুর্বলতা আর বোকামীর কাহিনী পড়ে হাসব।

দু'জনে হুইস্কী খাই। দু'একটা কাজু মুখে দিই। সিগারেট টানি। দু'পাঁচ মিনিট পর বলি, এখন কি তোমার কোন ছবির সুটিং চলছে না?

—কেন চলবে না? তিনটে ছবির শুটিং পুরোদমে চলছে।

—তাহলে এখন এখানে কেন এলে?

—ইচ্ছে হলো তাই চলে এলাম।

—শুটিং বন্ধ করলে তো প্রডিউসারের ক্ষতি হয়।

—হয়ই তো!

উর্বশী একটু হেসে বলল, ছবি রিলিজ হবার পর তো সুদে-আসলে সব পেয়ে যাবে। তাছাড়া কিছু কিছু লোককে জব্দ করার জন্য আমি যখন-তখন শুটিং বন্ধ করে দিই।

আমি চাপা হাসি হেসে বলি, তুমি বুঝি এইসব করে নিজের গুরুত্ব, নিজের দাম বাড়াও?

—হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ।

ও না থেমেই বলে, আমি দেখাতে চাই, আমি কারুর কৃপাপ্রার্থী না ; বরং বাংলা সিনেমা জগত আমার কৃপাপ্রার্থী।

—তুমি বড্ড অহংকারী।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আমি অহংকারী কিন্তু অহংকার করার মত আমার কি বিশেষ কোন গুণ নেই?

—এ সংসারে সবারই অল্পবিস্তর বিশেষ গুণ থাকে। তুমি বাংলা সিনেমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়িকা। তোমার নিশ্চয়ই অনেক গুণ আছে কিন্তু এত অহংকারী, এত দাম্ভিক হওয়া কি ভাল?

—এই অহংকার, এই দম্ভ আছে বলেই পুরনো দিনের নায়িকাদের মত প্রডিউসার—ডিরেক্টরদের রক্ষিতা হইনি, হবো না।

ও একটু হেসে বলে, আমি অহংকারী দাম্ভিক না হলে সিনেমা লাইনের হাঙরগুলো কবে আমাকে গিলে খেতো, তা কি জানো?

—ওরা তোমাকে গিলতে না পারলেও তুমি তো বহু হাঙর-কুমীরকে গিলেছ?

আমি হাসতে হাসতেই বলি।

উর্বশী চাপা হাসি হেসে বলে, এখন নো কমেন্টস। কাল থেকে আস্তে আস্তে সব বলব।

দরজায় নক্ করে মঙ্গল সিং ভিতরে এসে বলে, আপনারা কী নীচে ডিনার খেতে আসবেন নাকি...

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নীচেই দাও।

রাত্রে শোবার পর বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা মনে পড়লো।

টেলিফোন বাজতেই রিসিভার তুলে বলি, হ্যালো।

ওদিক থেকে অত্যন্ত মিহিগলায় এক মহিলা বললেন, আপনি কি বাচ্চুবাবু?

—হ্যাঁ কিন্তু আপনি কে?

—আমি চৈতালী রায়।

—কোন চৈতালী রায়?

—আমি অভিনেত্রী চৈতালী

উনি কথাটা শেষ করার আগেই বলি, ও মাই গড!

এক নিঃশ্বাসেই বলি, আপনি তো পদ্মভূষণ হচ্ছেন। আগামী কালই তো রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠান।

—হ্যাঁ। তাইতো

আবার ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই প্রশ্ন করি, আমার নাম বাচ্চু, তা জানলেন কি করে?

উনি একটু হেসে বললেন, পাহাড়ীদা বলেছেন।

—হ্যাঁ, পাহাড়ীদা আমাকে বহুদিন ধরে চেনেন ও খুবই স্নেহ করেন।

—পাহাড়ীদা শুধু আপনার নাম বলেন নি, আরো অনেক কিছু বলেছেন।

—অনেক কিছু মানে?

—উনি বলেছেন, আপনি মিনিস্টার-সেক্রেটারীদের একটা টেলিফোন

করলেই বহু কঠিন কাজ সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়।

আমি একটু হেসে বলি, না, না, সেরকম কিছু না। তবে বহুদিন দিল্লী আছি বলে বহু মন্ত্রী-সেক্রেটারীদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় আছে...

—আপনি যত বিনয়ই করুন, আমি জানি, আপনি অনেক কিছু করতে পারেন।

আমি কিছু বলার আগেই মিসেস রায় বলেন, আমার একটা উপকার করে দিতে হবে আপনাকে।

—বলুন, কি করতে হবে।

—আমি এক বন্ধুকে নিয়ে কাল রাষ্ট্রপতি ভবনে যেতে চাই। তাই একটা কার্ড চাই।

—নো প্রবলেম। আপনার বন্ধুর নাম, তাঁর বাবার নাম, পার্মানান্ট ঠিকানা আর দিল্লীতে কোথায় আছেন বলুন। আপনি নিশ্চয়ই অশোকাতে আছেন?

—হ্যাঁ, অশোকাতেই আছি। রুম নাম্বার সিক্স ওয়ান থ্রী।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, ওসব নামধাম লাগবে না। আপনি এমনি একটা কার্ড পাঠিয়ে দিন।

মনে মনে বললাম, এটা আপনাদের ফিল্মের মহরত অনুষ্ঠান না। রাষ্ট্রপতি ভবনের যে অনুষ্ঠানে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও আরো বহু ভি-ভি-আই-পি থাকবেন, সেখানে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর অনুমতি না দিলে ঐসব অনুষ্ঠানে অপরিচিত কেউ যেতে পারেন না।

যাইহোক মুখে বললাম, নামধাম ইত্যাদি না বললে তো রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে কার্ড দেবে না।

—তাহলে থাক।

আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে একটু হাসি। মনে মনে বলি, চৈতালী দেবী, আপনি অস্থায়ী প্রেমিকের নাম বলতে পারলেন না? এত ভয়? এত লজ্জা?

আমি সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মিঃ দত্তকে টেলিফোন করে পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে বললাম, ঐ ভদ্রলোক নিশ্চয়ই মিসেস্ রায়ের ঘরেই থাকছেন। অশোকা হোটেলে তো সব সময়ই

আপনাদের লোকজন থাকে।...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিঃ দত্ত একটু হেসে বললেন, তুমি ঐ ভদ্রলোকের নাম জানতে চাও?

—শুধু নাম না ; বাবার নাম, কলকাতার ঠিকানাও দরকার।

—ঠিক আছে ; আধ ঘণ্টার মধ্যেই তোমাকে সব জানিয়ে দিচ্ছি।

আধ ঘণ্টা তো দূরের কথা, পনের মিনিটের মধ্যেই মিঃ দত্ত সব জানিয়ে দিলেন। তারপর দুপুরের দিকে এক ফাঁকে পার্লামেন্ট থেকে সোজা চলে গেলাম রাষ্ট্রপতি ভবনে ব্যানার্জী সাহেবের কাছে। কফির পেয়ালা শেষ করার আগেই ব্যানার্জী সাহেব আমার হাতে একটা কার্ড দিয়ে বললেন, তুমিই নামধাম লিখে দিও।

অফিসে এসেই কার্ডে লিখলাম, গজানন আগরওয়াল। আর খামের উপর লিখলাম ঃ

মিঃ গজানন আগরওয়াল

সন অব লেট নন্দকিশোর আগরওয়াল

৩৪/সি, রেনি পার্ক

কলকাতা।

এইবার ঐ কার্ডখানা একটা বড় খামের মধ্যে ভরে খামের উপর মিসেস রায়ের নাম, রুম নাম্বার ইত্যাদি লিখে নীচে বড় বড় হরফে লিখলাম ঃ ফ্রম বাচ্চু!

এক মুহূর্ত দেরি না করে আমার পিয়ন মনোহরলালকে বললাম, এই প্যাকেটটা এক্ষুনি অশোকা হোটেলের রিসেপশনে পৌঁছে দিয়ে পিয়ন বুকে সই করিয়ে আনবে।

সে রাত্রে মিসেস রায় বার বার ফোন করেছেন। আমি পাশে বসে থাকলেও রিসিভার তুলি নি। প্রত্যেকবারই সরযূ বলেছে, সাহাব ঘরমে নেই হ্যায়। পার্টি মে গিয়া।

আমি শুধু হাসি।

পরের দিন রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠানের শেষে চায়ের মজলিশে মিসেস

রায় এক গাল হাসি হেসে বললেন, আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক!

—ডেঞ্জারাস কেন? আমি কি আপনার কোন ক্ষতি করেছি?

—অশেষ অশেষ ধন্যবাদ।

তারপর মিসেস রায় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু চাপা গলায় বললেন, তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার বন্ধুত্ব হবে। যদি কাজ না থাকে, তাহলে এখনই আমাদের সঙ্গে হোটেলে চলো।

—সত্যি আসব?

আমি একটু হেসেই জিজ্ঞেস করি।

—প্লীজ আমাদের সঙ্গে চলো। তুমি এলে খুব খুশি হবো।

হ্যাঁ, সেই রাত্রে চৈতালী আর গজাননের সঙ্গে হুইস্কী খেতে খেতেই আমি ওর নামকরণ করি উর্বশী।

চৈতালী লাফিয়ে উঠে আমার দুই গালে চুমু খেয়ে বলল, কেউ আমাকে এত সুন্দর নাম দিতে পারে নি।

দুই

সে অনেক দিন আগেকার কথা। সদ্য খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়েছি। বয়স অল্প, উৎসাহ বেশি। বিধানসভা বা বিধান পরিষদের অধিবেশন না থাকলে রাইটার্স বিল্ডিং-লালবাজারের রাউন্ড শেষ করে কোনদিন দু'একটা জনসভা কভার করি, কোনদিন দু'একটা সাংবাদিক সম্মেলনে যাই।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, প্রধানমন্ত্রী নেহরু পরের দিন বোকারো আসছেন বলে চীফ রিপোর্টার একদিন আগেই সেখানে গেলেন। বিধানসভায় গেলেন ডেপুটি চীফ রিপোর্টার; অন্য দু'জন রিপোর্টারকে ভার দেওয়া হলো রাইটার্স আর লালবাজারের। আমাকে বলা হলো শিল্পপতি পি.এন. চাকলাদারের প্রেস কনফারেন্সে যেতে।

শিল্পপতি হিসেবে পি. এন. চাকলাদারের খ্যাতি তখন ভারতব্যাপী। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিখ্যাত এঞ্জিনিয়ারিং কারখানার প্রধান অংশীদার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর, দুটি সর্বভারতীয় ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর, বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ রেড ক্রশের প্রেসিডেন্ট। উনি তানসেন

সঙ্গীত সম্মেলন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাইন আর্টস সোসাইটিরও সভাপতি ছিলেন।

শুধু কি তাই? পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপারে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। বিধান রায় যখন তখন ডেকে পাঠিয়ে নানা বিষয়ে তাঁর মতামত জানতে চান।

প্রবীণ রিপোর্টারদের কাছে শুনেছি ভদ্রলোক সুদর্শন, সুপুরুষ, ব্যাচেলার, রসিক, বন্ধু বৎসল ও বেশ উদার।

এ হেন ব্যক্তি তো ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মত শুধু চা আর স্যান্ডউইচ খাইয়ে প্রেস কনফারেন্স করতে পারেন না। গ্রান্ডে ঠিক সন্ধে সাতটায় প্রেস কনফারেন্স ও তারপর ককটেল অ্যান্ড ডিনার।

স্বয়ং এডিটর আমাকে ডেকে বললেন, চাকলাদারের প্রেস কনফারেন্স ভালভাবে কভার করবে। উনি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিলে আমাদের কাগজ চালানোই মুশকিল হবে।

যাইহোক দুর্গাপুরে অত্যাধুনিক এক ভাবী শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ঘোষণা করেই মিঃ চাকলাদার হাসতে হাসতে বললেন অনেক বক বক করেছি। নাউ লেট আস মুভ অন টু দ্য নেক্সট রুম ফর ককটেল

দু'এক রাউন্ড ড্রিঙ্কের পরই নব প্রভাত পত্রিকার চীফ রিপোর্টার চ্যাটার্জীদা হাসতে হাসতে মিঃ চাকলাদারকে বললেন, দাদা, আপনার বাড়িতে কবে পার্টি দিচ্ছেন?

—যেদিন তোমরা বলবে।

নতুন খবর পত্রিকার গোস্বামীদা সঙ্গে সঙ্গে বললেন আপনার বাড়িতে গেস্ট হিসেবে শুধু আপনি থাকলেই হবে না। আপনার নতুন বান্ধবীকেও থাকতে হবে।

চ্যাটার্জীদা আর ঘোষদা প্রায় একসঙ্গেই বলেন, সে আর বলতে হবে না! আজকাল চাকলাদার সাহেবের সব পার্টিতেই তো উনি থাকেন।

মিঃ চাকলাদার একটু হেসে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চৈতি থাকবে।

ঘোষদা একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন, সামনের রবিবারই কি আমরা আসব?

—তোমরা রবিবার আসতে চাও?

তিন-চারজন প্রবীণ রিপোর্টার সমস্বরে বললেন, শুভস্য শীঘ্রম!

মিঃ চাকলাদার কোটের পকেট থেকে ছোট্ট ডায়েরী বের করে দু'চারটে পাতা উল্টে দেখেই বললেন, হ্যাঁ, তোমরা রবিবারই এসো। আমি বুধবার টোকিও যাবো।

উনি ইসারা করে প্রাইভেট সেক্রেটারীকে ডেকে বললেন, আজ এখানে যেসব রিপোর্টাররা এসেছে, তাদের সবার বাড়ির ঠিকানা নোট করে নিন।

দু'দিন পরই আমার বাড়িতেও নিমন্ত্রণপত্র এসে হাজির।

রবিবার মিঃ চাকলাদারের আলিপুরের ঐ বিশাল প্রাসাদে হাজির হয়ে আমি অবাক! জনপ্রিয় অভিনেত্রী চৈতালী রায় ওঁর বান্ধবী? এই চৈতালীই ওর চৈতি? মিঃ চাকলাদারের এই বান্ধবীকেই প্রবীণ রিপোর্টাররা পার্টিতে থাকার কথা বলছিলেন?

আমি তরুণ রিপোর্টার হলেও বেশ বুঝতে পারলাম, এই অসামান্য সুন্দরী অভিনেত্রীর সঙ্গে চাকলাদার সাহেবের সম্পর্ক বেশ নিবিড় ও খুব সাম্প্রতিক না।

আমি কোনকালেই খুব বেশি সিনেমা দেখি না। তখন সময়ও হতো না। অপরাহ্ণ থেকে মাঝ রাত্তির পর্যন্ত খবরের কাগজের কাজে ব্যস্ত থাকলে কি সিনেমা দেখা যায়? তবু বন্ধুবান্ধবের পাল্লায় পড়ে চৈতালী রায়-চঞ্চলকুমার অভিনীত 'তোমাকে চাই' দেখেছিলাম। ওদের দু'জনের রোমান্টিক অভিনয় দেখে সত্যি ভাল লেগেছিল। আমি সিনেমা না দেখলেও পত্র-পত্রিকার দৌলতে জানতাম, সুনন্দা-সন্ধ্যারানীদের যুগ শেষ। নতুনদের মধ্যে শুধু চৈতালী রায় বাঙ্গালীর মন জয় করতে পেরেছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার বিখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক এন. কে. জি. তো ঘোষণাই করে দিলেন, প্রমথেশ বড়ুয়া-কানন দেবীর পর চৈতালী রায়-চঞ্চলকুমারই বাংলা সিনেমার বর্তমান ও ভবিষ্যত।

সন্ধে সাতটা থেকে রাত এগারটা পর্যন্ত ঐ পার্টিতে ছিলাম। মিঃ চাকলাদারের সঙ্গে চৈতালী রায়কে অত্যন্ত অন্তরঙ্গভাবে মেলামেশা হাসাহাসি করতে দেখলাম। দেখলাম, চাকলাদার সাহেবের মুখ থেকে

সিগারেট নিয়ে চৈতালী রায় টানছেন, একই গেলাস থেকে দু'জনে ড্রিঙ্ক করছেন। চৈতালী রায় ফিস ফ্রাই এক কামড় খেয়েই বাকিটা চাকলাদারকে খাইয়ে দিলেন।

শুধ কি তাই?

তিন-চার পেগ পেটে পড়ার পরই দু'জনই দু'জনকে আমাদের সবার সামনে চুম্বন করলেন।

আমি বুঝলাম, চৈতালী রায় চঞ্চলকুমারের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেন কিন্তু ভালবাসেন মিঃ চাকলাদারকে।

সেদিনের সেই পার্টির পর আমি আরো একবার মিঃ চাকলাদারের আলিপুরের বাংলোয় গিয়েছি কক্‌টেল-ডিনারে। সে এলাহি ব্যাপার! কে আসেন নি? সব বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক, চঞ্চলকুমার থেকে উঠতি নায়ক, বাংলা সিনেমার ডজন খানেক অভিনেত্রী, জন দশেক বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের বিখ্যাত খেলোয়াড়রা, কলকাতার সব বিখ্যাত শিল্পপতি ও জন পঞ্চাশেক সাংবাদিক।

তখন বোধহয় সাড়ে আটটা-ন'টা বাজে। পুরোদমে পার্টি চলছে। হঠাৎ সব আলো অফ্ হবার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল লনের কোনার ছোট্ট মঞ্চের। মঞ্চের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন মিঃ চাকলাদার ও চৈতালী রায়। সামনে মাইক্রোফোন। মিঃ চাকলাদার বললেন, লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলমেন, মে আই রিকোয়েস্ট অল অব ইউ টু উইস চৈতি এ ভেরি হ্যাপি বার্থ ডে!

চারদিক থেকে সবাই একসঙ্গে বললেন, হ্যাপি বার্থ ডে টু চৈতালী রায়।

চৈতালী রায় খুশির হাসি হেসে মাথা নীচু করে সবার শুভেচ্ছা গ্রহণ করলেন।

এর পর মিঃ চাকলাদার বললেন, আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি চৈতিকে একটা সামান্য উপহার দিচ্ছি।

উনি চৈতালী রায়ের গলায় হার পরিয়ে দেবার সময়ই চারপাশ থেকে মহিলারা চাপা গলায় বললন, মাই গড! ডায়মন্ড!

তারপর?

ক্লার্ক গাবল-গ্রেটা গার্বোর মত মিঃ চাকলাদার আর চৈতালী রায় দু'জনে

দু'জনকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে একটা দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন!

না, সেদিনের পর আমি আর ওদের দু'জনকে একসঙ্গে কোনদিন দেখিনি।

বছর তিনেক পরের কথা।

রাত সাড়ে দশটা-এগারটা বাজতে বাজতেই অন্যান্য রিপোর্টাররা চলে গেল। আমি নাইট ডিউটির জন্য আছি। পুলিশ, হাসপাতাল, দমকলে ফোন করে খবর নিচ্ছি। হঠাৎ নিউজ এডিটর পুলিনদা ঝড়ের বেগে রিপোর্টার্স রুমে ঢুকেই আমার সামনে পি-টি-আই' এর একটা দু'লাইনের ফ্ল্যাশ মেসেজ রেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট পি.এন.চাকলাদার মারা গিয়েছেন। তুমি এক্ষুনি ওর বাড়ি যাও।

উনি না থেমেই বললেন, তুমি চাকলাদার সাহেবের বাড়ি চেনো তো?

—হ্যাঁ ; আমি ওর আলিপুরের বাড়িতে দু'বার নেমন্তন্ন...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই পুলিনদা বললেন, না, না, আলিপুর না। উনি মারা গিয়েছেন ওর আমীর আলি এভিনিউ-এর বাড়িতে।

পি-টি-আই' এর কপিটা দেখিয়ে বললেন, এই তো বাড়ির নম্বর।

ঠিক সেই সময় সম্পাদক মশাই নীচে নেমে এসে আমায় বললেন, তুমি গাড়ি নিয়ে এক্ষুনি চলে যাও। যে কোন একজন ফটোগ্রাফার পনের-বিশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে।

আমীর আলি এভিনিউ এর বাড়িতে পৌঁছে দেখি, চাকলাদার সাহেবের আত্মীয়-স্বজন ও শিল্পপতিদের ভীড়। আমি যাবার দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ফটোগ্রাফার শ্যামল এসে হাজির। তার দু'মিনিট পরই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় এসে পৌঁছলেন। এলেন আরো কত গণ্যমান্য ব্যক্তি।

মনে মনে ভাবি, চৈতালী রায় কোথায়? তিনি কি শোকে জ্ঞান হারিয়েছেন? নাকি কোন ছবির আউট ডোর শুটিং 'এর জন্য কলকাতার বাইরে?

চাকলাদার সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী গৌতমদাকে একটু একা পেয়েই ওর কানে কানে জিজ্ঞেস করি, চৈতালী রায় কি এখানে নেই?

উনি গম্ভীর হয়ে চাপা গলায় বললেন, চৈতি দেবীর সঙ্গে তো অনেক দিন স্যারের কোন সম্পর্ক নেই।

—অনেক দিন মানে?

—প্রায় বছর দুই।

না, সেদিন গৌতমদাকে আর কোন প্রশ্ন করি নি। ঐ পরিবেশে আর কোন প্রশ্ন করা সমীচীন হতো না।

মাসখানেক পর সিনেমা এডিটরের ঘরে বসে আড্ডা দেবার সময় জিজ্ঞেস করি, বিমলদা, চৈতালী রায়ের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বরটা দেবেন?

উনি সঙ্গে সঙ্গে সামনের প্যাডে ওর ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লিখে কাগজটা আমার হাতে দিয়েই একটু হেসে বললেন, চৈতালী রায়ের ঠিকানা-টেলিফোন নম্বর না জানলে কি সিনেমা এডিটরের চাকরি করা যায়?

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম, ঠিক তাই। আমার পুরনো ডায়েরী খুলে দেখলাম, চাকলাদার সাহেবের সেই বাংলো, সেই টেলিফোন নম্বর।

চৈতালী রায় ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছেন। বছরের পর বছর ধরে তাঁর ছবি অসামান্য সাফল্য লাভ করেছে। ভাবপ্রবণ রোমান্টিক বাঙ্গালীরা তাঁর বিস্ময়কর অভিনয় দেখে শুধু মুগ্ধ হয় নি, তাঁকে প্রাণমন দিয়ে ভালবেসেছে। তাঁর মুখের হাসি দেখে অসংখ্য সমস্যা-জর্জরিত বাঙ্গালী হেসেছে, তাঁর বিদ্যুত চাহনিতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে ঝড় উঠেছে। আবার তাঁর চোখের জল দেখেও বাঙ্গালী হাপুস নয়নে কেঁদেছে।

আমি সিনেমা জগত থেকে সহস্র যোজন দূরের মানুষ। রিপোর্টার হিসেবে আমি রাজনীতিবিদদের সঙ্গে দিবারাত্রি ওঠা-বসা করি। রিপোর্ট লিখি তাঁদের মহত্ত্ব দুর্বলতা নিয়ে। তবুও বেশ কয়েকবার চৈতালী রায়কে নিয়েও আমার রিপোর্ট লিখতে হয়েছে।

তখন বসুশ্রী সিনেমায় বাংলা নববর্ষের দিন সকালে এক বিরাট বিচিত্রানুষ্ঠান হতো। সে অনুষ্ঠানে সমস্ত বিখ্যাত গায়ক-গায়িকারা ছাড়াও সিনেমার বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীও উপস্থিত থাকতেন।

সেবারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে। সকালবেলায় খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতেই চোখে পড়লো বসুশ্রীর বিচিত্রানুষ্ঠানের বিরাট বিজ্ঞাপন। পঞ্চাশ-ষাটজন গায়ক-গায়িকা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম ছোট ছোট হরফে ছাপা হলেও অত্যন্ত বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে—আজকের এই অনুষ্ঠানে বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠা নায়িকা শ্রীমতী চৈতালী রায় উপস্থিত থাকবেন।

এই নববর্ষের দিন সকাল বেলায় আমাদের পত্রিকা অফিসেও একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান হতো। শিক্ষা-সংস্কৃতি জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নববর্ষ সম্পর্কে কিছু বলতেন। তারপর দু'তিনজন বিশিষ্ট গায়ক-গায়িকা গান শোনাতেন। সব শেষে খাওয়া দাওয়া।

আমার বেশ মনে আছে দ্বিজেন মুখার্জীর গান শুরু হতেই চীফ রিপোর্টার অজিতদাকে কে যেন ডাকতেই উনি ছুটে গেলেন নিউজ ডিপার্টমেন্টে। দু'চার মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে উনি সম্পাদকের সঙ্গে কি যেন আলোচনা করলেন। তারপরই অজিতদা আমাকে বললেন, এক্ষুনি বসুশ্রীতে চলে যাও। ওখানে ভীষণ গণ্ডগোল হচ্ছে। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুড়ছে কিন্তু তাতে কিছু না হলে নিশ্চয়ই ফায়ারিং শুরু করবে।

পনের-কুড়ি মিনিটের মধ্যে হাজরার মোড়ে পৌঁছেই দেখি জনতা-পুলিশে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ চলছে। মিনিটে মিনিটে টিয়ার গ্যাস শেল ফাটছে এদিক-ওদিক। রাইফেলধারী আর্মড পুলিশও তৈরি। দক্ষিণের দিকে একটু এগিয়ে দেখি, পুলিশের একটা ভ্যান আর একটা জীপ দাউ দাউ করে জ্বলছে। দু'তিনজন ডেপুটি কমিশনার রণহুঙ্কার দিয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছেন। হঠাৎ এক ডেপুটি কমিশনারের মাথায় বিরাট একটা ইটের টুকরো এসে লাগতেই তিনি চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। ঠিক সেই সময় ডি.সি (হেড কোয়ার্টার্স) ওখানে পৌঁছেই চিৎকার করলেন, ফায়ার!

ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটির পর একটি রাইফেল।

দশ মিনিটের মধ্যেই সব শান্ত! ক্ষিপ্ত জনতা উধাও। উন্মুক্ত রাজপথে পড়ে রইল তিনটি মৃতদেহ। তারমধ্যে একজন বৃদ্ধ। তারপাশে পড়ে আছে শাক-সবজি ভর্তি রেশন ব্যাগ। নিশ্চয়ই বাজার করে ফিরছিলেন। রেড

ক্রুশের ভ্যান এসে গুলিতে আহত জন পনের মানুষকে নিয়ে ছুটল পি.জি হাসপাতাল।

তারপর?

বসুশ্রী থেকে বেরিয়ে এলেন ভয়ার্ত নারীপুরুষের দল। সব দর্শক-শ্রোতারা বেরিয়ে আসার পাঁচ-দশ মিনিট পর একে একে বেরিয়ে এলেন গায়ক-গায়িকা অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। সব শেষে তিনজন ডেপুটি কমিশনার আর দশ-বারোজন সশস্ত্র পুলিশের প্রহরায় বেরিয়ে এলেন হার ম্যাজেস্টি চৈতালী রায়। এই মহারানীকে একবার চর্মচক্ষু দিয়ে দেখার জন্যই নববর্ষের সকালে এই কুরুক্ষেত্র ঘটে গেল।

মনে মনে বললাম, ধন্য তোমার রূপলাবণ্য, ধন্য তোমার মহিমা!

এই চৈতালী রায়কে নিয়ে আরো কত কি ঘটেছে।

নাইট ডিউটি দিচ্ছি। এখানে-ওখানে টেলিফোন করছি খবরের জন্য। শিয়ালদ' জি-আর-পি'তে ফোন করতেই ও-সি একটু হেসে বললেন, না, খুন-জখম লুটপাটের খবর নেই; তবে যদি বেশ রসের কাহিনী লিখতে চান, চলে আসুন।

—রসের কাহিনী মানে?

—বলছি তো, বেশ মজাদার রসের কাহিনী আছে কিন্তু এখানে না এলে আপনি লিখতে পারবেন না।

—ঠিক আছে, দেখছি।

অন্যান্য সব কাজ শেষে রাত দেড়টা নাগাদ শিয়ালদ' জি-আর-পি'র ও-সি'র অফিসে ঢোকার মুখেই হাসাহাসির আওয়াজ শুনে অবাক হই। দারোগাবাবুরা সুন্দর অশ্লীল ভাষায় চোর-ডাকাত-পকেটমারদের গালাগালি দেবেন বা বাইরের লোকজনদের সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন—এটাই স্বাভাবিক ও আমরা আশা করি। এর ব্যতিক্রম হলেই আমরা অবাক হই।

ঘরে মধ্যে পা দিতেই ও-সি সাহেব এক গাল হাসি হেসে বললেন, আসুন, আসুন।

একজন সাব-ইন্সপেক্টর তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে আমাকে বসতে

দিলেন। আমি চেয়ারে বসতেই ডান দিকের চেয়ারে বসা এক সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়ে ও-সি সাহেব ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললেন, ইনি জয়শ্রী দেবী। চৈতালী রায়ের সঙ্গে সঙ্গে ইনিও বাংলা সিনেমার বিখ্যাত হিরোইন হতে চলেছেন।

আমি জয়শ্রীর দিকে তাকাতেই উনি মুখ নীচু করলেন।

জয়শ্রীর পাশে বসা যুবকটিকে দেখিয়ে ও-সি সাহেব চোয়াল বেশ শক্ত করে বললেন, এই শূয়োর কা বাচ্চা স্টুডিও'তে এক্সট্রা সাপ্লাই করে।

আমার চোখ-মুখের চেহারা দেখেই ও-সি বুঝলেন, ওর ভাষা আমার আদৌ ভাল লাগে নি। তাই উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, এই ছোকরা কি ধরনের বদমাইস, তা আপনি ভাবতে পারবেন না।

ঘরের কোনো দাড়ানো দু'জন কনস্টেবলকে দেখিয়ে উনি বললেন, এরা দেখতে না পেলে এই হারামজাদা বোধহয় আজ এই মেয়েটাকে খুনই করতো।

—বলেন কি?

ও-সি সাহেব আমার কথার জবাব না দিয়ে আমাকে দেখিয়ে জয়শ্রীকে বললেন ওনাকে সব কথা বলো তো।

জয়শ্রী ঘর ভর্তি লোকের সামনে কথা বলতে ইতস্ততঃ করায় ও-সি সাহেব সাব-ইন্সপেক্টর আর কনস্টেবলদের বাইরে যেতে বললেন।

হ্যাঁ, তারপরই জয়শ্রী আমাকে সব কথা বলে।...

নৈহাটি রেল স্টেশনের পূব দিকে শহীদ ভগৎ সিং কলোনীর নগেন মাস্টারের পাঁচ মেয়ের মধ্যে সব চাইতে বড় হচ্ছে জয়শ্রী। একে দেখতে সুন্দর, তার উপর যেমন গানের গলা, সেইরকমই নাচতে পারে বলে সবাই ওকে ভালবাসে, স্নেহ করে। প্রত্যেক বছর স্কুলের রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে বড় বড় মেয়েদের সঙ্গে নাচে ন'বছরের জয়শ্রী। জয়শ্রীর নাচ শেষ হবার পর কতক্ষণ ধরে হাততালি পড়ে।

জয়শ্রী যখন বারো-তেরো বছরের, তখনই ওর মা মেয়ের নাচ বন্ধ করে দিলেও ভাল করে গান শেখাবার জন্য রেডিও আর্টিস্ট জয়ন্তবাবুর কাছে

পাঠাতে শুরু করলেন।

শহীদ ভগৎ সিং কলোনী থেকে জয়ন্তবাবুর বাড়ি প্রায় মাইল দুয়েকের পথ। এই কলোনীরই অন্য দুটি মেয়ের সঙ্গে হেঁটেই যাতায়াত করে।

স্টেশন পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই রেখা নৈহাটি সিনেমা হলের সামনের ছবি দেখিয়ে জয়শ্রী আর মায়াকে বলে, এই সিনেমায় যাবি? চৈতালী রায়ের ছবি।

রেখা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, সবাই বলাবলি করছিল দারুণ ছবি। চৈতালী রায়ের অভিনয় দেখে মাথা ঘুরে যাবে।

জয়শ্রী বলে, এখন তো মাস্টার মশায়ের বাড়ি যাচ্ছি। সিনেমা দেখব কি করে?

মায়া বলে, তাছাড়া যদি বাড়িতে জানতে পারে, তাহলে তো...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই রেখা বলে, বাড়ির লোকজন জানবে কি করে? আমরা তো তিনজনেই একসঙ্গে সিনেমা দেখব।

জয়শ্রী বলে, সিনেমা দেখব কি করে? আমার কাছে তো টিকিট কাটার পয়সাও নেই।

মায়া বলল, আমার কাছে প্রায় পাঁচ টাকা আছে।

রেখা বলল, তোদের কাউকেই পয়সা দিতে হবে না। আজ আমিই তোদের দেখাচ্ছি। এরপর চৈতালী রায়ের বই এলে তোরা আমাকে দেখাবি।

সেই শুরু। তারপর চৈতালী রায়ের কোন ছবি বাদ দেয় নি। কোন কোন ছবি পাঁচ-ছ'বার দেখেছে। পড়াশুনায় মন বসে না। সব সময়ই চৈতালী রায়ের অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তারপর স্বপ্ন দেখে অভিনেত্রী হবার। লুকিয়ে-চুরিয়ে রূপ চর্চা করে। দেহটাকে সজীব সতেজ সুন্দর রাখার জন্য আরো কত কি করে। বাথরুমে গিয়ে বার বার নিজের দেহ দেখে। আয়নায় নিজের মুখ দেখে যখন তখন।...

সারাদিনের ক্লান্তির পর রাত দুটোর সময় থানায় বসে জয়শ্রীর এত দীর্ঘ কাহিনী শুনতে ভাল লাগে না। বেশ বিরক্ত হয়েই বলি, ওসব পুরনো কথা বাদ দিন। আসল ব্যাপারটা বলুন।

জয়শ্রী সামান্য একটু ঘাড় ঘুরিয়ে পাশের ঐ ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলে,

এই গণেশদা আমার এক বন্ধুর পিসতুতো দাদা। বন্ধুর কাছেই শুনেছিলাম, ইনি সিনেমা লাইনে কাজ করেন। তাই বন্ধুর বাড়িতে গণেশদার সঙ্গে আলাপ হবার পরই বললাম, আমি সিনেমায় নামতে চাই। চৈতালী রায়ের মত নায়িকা না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।

তারপর?

—গণেশদা মাঝে মধ্যে আমাকে স্টুডিও যেতে বলতেন। একটু-আধটু শুটিং দেখাতেন বা স্টুডিও'র দু'চারজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন।

—তখন তোমার বয়স কত?

—তখন আমি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে কলেজে পড়ছি।

—তার মানে আঠারো উনিশ?

—হ্যাঁ, ঐ রকমই হবে।

—হ্যাঁ, বলে যাও।

জয়শ্রী বলে যায়, যেদিনই স্টুডিও পাড়ায় যেতাম, সেদিনই গণেশদা আমাকে নিয়ে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যেতেন অথবা সিনেমা দেখাতেন।

ও-সি সাহেব একটু গলা চড়িয়েই বললেন, আর কি করতো, সেটাও বলো।

জয়শ্রী মুখ নীচ করে বলে, গণেশদা মাঝে মাঝে একটা থিয়েটার গ্রুপের রিহর্সাল রুমে নিয়ে গিয়ে আমাকে এনজয়ও করতেন।

—তুমি আপত্তি করতে না?

—না, আপত্তি করতাম না।

—কেন?

—তখন ভেবেছি, গণেশদাকে খুশি করলেই আমি সিনেমার হিরোইন হতে পারবো।

—উনি তোমাকে ছোট-খাটো কোন রোল পর্যন্ত দেননি?

—দু'চারটে ছবিতে বিয়েবাড়ির সিনে বা স্কুল-কলেজের দৃশ্যে আরো অনেকের সঙ্গে নামতে বলেছেন কিন্তু আমি রাজি হইনি।

—তারপর?

—এর পর গণেশদা খোলাখুলি আমাকে বললেন, আজকাল ডিরেক্টর-দের কোন ক্ষমতা নেই। যার টাকায় ছবি হয়, তিনিই বলে দেন কে নায়িকা হবে। তাই তুমি যদি প্রডিউসারদের খুশি না করো তাহলে অন্তত হিরোইন হবার সুযোগ তুমি পাবে না।

—তুমি রাজি হলে?

—চৈতালী রায়ের মত হিরোইন হবার স্বপ্নে আমি উন্মাদ বলেই সে প্রস্তাবেও রাজি হয়ে গেলাম।

—চমৎকার!

ও-সি সাহেব আবার গর্জে উঠলেন, রাত প্রায় তিনটে বাজে। শেষ পর্যন্ত কি হলো তাই বলো।

জয়শ্রী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখ নীচু করে বলে, প্রত্যেক শনিবার গণেশদার সঙ্গে নিউ আলিপুরের একটা ফ্ল্যাটে যেতাম। সেখানে প্রভুদয়াল আগরওয়ালা নামে এক প্রডিউসার আমাকে এনজয় করে হাতে দু'আড়াই শ' টাকা দিতেন। মনে হতো উনি গণেশদাকেও টাকা দিতেন।

ও একটু থেমে বলে, এইভাবে বছর দুই চলার পর পরশুদিন প্রভুদয়ালজী নিজে আমাকে বললেন, উনি বড়বাজরে কাপড়ের ব্যবসা করেন ; সিনেমা লাইনের সঙ্গে ওর কোন সম্পর্ক নেই। উনি গণেশদাকে টাকা দেন আর গণেশদা ওকে মেয়ে সাপ্লাই করে।

—লাভলি!

—এরপর আমি বেশ বুঝতে পারলাম, সিনেমায় চান্স করে দেবার লোভ দেখিয়ে মেয়েদের সর্বনামশ করাই গণেশদার কাজ।

জয়শ্রী আবার একটু থামে। তারপর বলে, অনেক দিন পর আজ গণেশদাকে ধরতে পেরে তুমুল ঝগড়া করি।

—কি করে ধরেল?

—আমি তো জানি, উনি রোজ রাত্তির সাড়ে ন'টা দশটার ট্রেন ধরে বেলঘরিয়ায় ফেরেন। তাই ওত পেতে বসেছিলাম এই স্টেশনে।

ও-সি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জানেন ভাই, এই জানোয়ারটা মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে চলন্ত ট্রেনের সামনে ফেলে দিচ্ছিল।

ভাগ্যক্রমে ঠিক্ ঐ সময় দু'জন কনেস্টেবল ওখান দিয়ে যাচ্ছিল বলে মেয়েটা বেঁচে গেল।

আমি ও-সি সাহেবকে বলি, ওর বিরুদ্ধে কি খুনের চেষ্টা করার অভিযোগ আনবেন?

ও-সি সাহেব হাসতে হাসতে বলেন, আগে আজ সারারাত ধরে শ্রীমানকে বেশ ভালভাবে ধোলাই দিই। তারপর কাল সকালে ভেবে দেখব কি করা যায়।

আমি জয়শ্রীকে বললাম, তাহলে তুমি চৈতালী রায়ের মত নায়িকা হতে পারলে না?

ও শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আমি ধীর পদক্ষেপে থানা থেকে বেরিয়ে এলাম।

হ্যাঁ, পরের দিন পুরো কাহিনীটি লিখেছিলাম। চীফ রিপোর্টার অজিতদা রিপোর্টটা পড়ে একটু হেসে বললেন, ইন্টারেস্টিং!

চীফ্ সাব ঐ রিপোর্টের হেডিং দিয়েছিলেন, চৈতালীর হাতছানি!

তিন

পরের দিন সকালে উঠে পর পর দু'কাপ চা খেয়ে বাথরুম গেলাম। সবকিছু সেরে বেরিয়ে আসতেই দেখি, চৈতালী রায় বসে আছে।

আমি হাসতে হাসতে বলি, কি ব্যাপার? এই সাত সকালে আমার ঘরে?

—তোমার কাছে সাড়ে আটটা-ন'টা সাত সকাল হলেও আমার কাছে অনেক বেলা।

আমি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে প্রশ্ন করি, আজ বুঝি খুব সকাল সকাল ঘুম ভেঙেছে?

—শুধু আজ না; রোজই আমি পাঁচটার মধ্যে উঠি।

আমি ঘাড় ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলি, বাবা! তুমি কি সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছে?

—সন্ন্যাসিনী কি সর্বনাশী, তা জানি না। তবে খুব ছোটবেলা থেকেই আমার ভোরে ওঠার অভ্যাস।

ওর সামনের সোফায় বসেই বলি, বলো, কি ব্যাপার?

—তোমাকে আমি আমার কথা বলতে এলাম।

—সত্যি তুমি আমাকে তোমার কথা বলতে চাও?

ও হঠাৎ গলার হারের লকেটটা মাথায় ছুঁইয়ে বলল, আমি আমার গুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি, তোমাকে সব কথা বলতে চাই। আমি একটু হাল্কা হতে চাই।

আমি অবাক হয়ে বলি, তুমি দীক্ষা নিয়েছ?

ও বেশ গম্ভীর হয়ে বলল, যদি নটী বিনোদিনী স্বয়ং ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারেন, তাহলে আমি কেন দীক্ষা নিতে পারবো না?

দু'এক মিনিট চুপ করে একটু ভেবেচিন্তে বললাম, হ্যাঁ, উর্বশী, বলো কি বলতে চাও।

চৈতালী শুরু করে, আমাদের দেশ সিলেটের হবিগঞ্জ। ঐ হবিগঞ্জেই চৈত্র সংক্রান্তির দিন আমার জন্ম।

—তাই তোমার নাম চৈতালী?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, আমার জন্মের বেশ কয়েক মাস আগেই আমার ঠাকুমা মাকে বলেছিলেন, বৌমা, আমি বলে দিচ্ছি, তোমার মেয়ে হবে আর তার নাম রাখবো চৈতালী।

—শুনেছি, আগেকার দিনের ঠাকুমা-দিদিমারা গর্ভবতীদের লক্ষণ দেখে বলতে পারতেন ছেলে না মেয়ে হবে।

—পারতেনই তো!

—তোমরা সবাই কি হবিগঞ্জেই থাকতে?

—হবিগঞ্জে আমার দুই জ্যাঠা থাকতেন। বড় জ্যাঠা ছিলেন স্কুলের হেড মাস্টার আর মেজ জ্যাঠা ছিলেন সুর্মা ভ্যালী স্টীমার কোম্পানীর হেড ক্যাশিয়ার। ঠাকুমা আর আমার এক বিধবা পিসীও ওখানেই থাকতেন।

—তোমার বাবা-মা?

—বাবা ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলে চাকরি করতেন। কালনা, কাটোয়া, নবদ্বীপ

ছাড়াও আরো নানা জায়গায় থাকার পর বর্ধমানের স্টেশন মাস্টার হয়ে রিটায়ার করেন।

চৈতালী একটু থেমে বলে, আমি হবার তিন-চার মাস আগেই বাবা মাকে হবিগঞ্জে রেখে আসেন।

—তারপর তুমি একটু বড় হলেই তোমার মা তোমাকে নিয়ে...

ও আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই একটু হেসে বলে, আমিই আমাদের বংশের এক মাত্র মেয়ে। মেজ জ্যাঠার দুই ছেলে থাকলেও বড়মা-বড় জ্যাঠার কোন ছেলেমেয়ে ছিল না। আমাকে পেয়ে সবাই যেন হাতে স্বর্গ পেলেন।

আমি একটু হাসি।

—আমি বছর খানেকের হবার পর মা বাবার কাছে চলে গেলেন। আমি হবিগঞ্জেই থেকে গেলাম।

—ওখানে কত দিন ছিলে?

—আমি চোদ্দ বছর বয়সে হবিগঞ্জ থেকে কলকাতা আসি।

ও একটু থেমে বলে, আমি যখন ন'বছরের তখন ঠাকুমা মারা যান। তার ঠিক পাঁচ বছর পর বড়মা মারা গেলেন। তাই বড় জ্যাঠা আমাকে পাঠিয়ে দেন।

—তুমি যখন কলকাতা এলে তখন কি তোমার বাবা রিটায়ার করেছেন?

—না, না. বাবা তখন চাকরি করছেন। বাগবাজারের বাড়িটা ছিল আমার দাদুর। দাদু ঐ বাড়িটা মাকে দিয়েছিলেন।

—তুমি যখন কলকাতা এলে, তখন তোমার মা তোমাকে নিয়ে বাগবাজারের ঐ বাড়িতেই থাকতেন?

—হ্যাঁ। বাবাও প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসতেন।

—তোমরা ক' ভাইবোন?

—আমার এক ভাই হয়েছিল কিন্তু সে তিন মাস বয়সেই মারা যায়।

ও একটু হেসে বলে, ঠাকুমা, বড় জ্যাঠা-বড় মা থেকে শুরু করে আমাদের বাড়ির সবাই আমাকে কি আদর-যত্নে মানুষ করেছেন, তা ভাবতে পারবে না। আমি আকাশের চাঁদ চাইলেও ওরা আমাকে চাঁদ এনে দিতেন

বলেই তো আমি একগুঁয়ে ও খামখেয়ালী হয়েছি।

আমি একটু হেসে প্রশ্ন করি, বিয়ের আগে প্রেমে পড়েছিলে?

—হ্যাঁ, সে কথাই এবার তোমাকে বলব।

চৈতালী একটু হেসে বলে, আমি যখন বারো বছর বয়সের, তখনই অপূর্ব বলে একটা ছেলে আমাকে প্রেমপত্র লেখে।

—অপূর্ব কি তোমার চাইতে সমবয়সী ছিল?

—ও আমার চাইতে দু'ক্লাস উপরে পড়তো।

—কি লিখেছিল?

—সব কথা মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে, ও লিখেছিল, আমাকে আদর করতে খুব ইচ্ছে করে।

—তুমি চিঠির জবাব দিয়েছিলে?

—ওরা আমাদের পাড়াতেই থাকতো। ওর বাবা বড় জ্যাঠার স্কুলেই মাস্টারী করতেন। দুই ফ্যামিলীর মধ্যে হরদম যাতায়াত ছিল। তাই চিঠি পাবার পরদিনই আমি ওদের বাড়ি গিয়ে ওর মা-র সামনেই বলি—

—এই অপুদা, তুমি আমাকে একটা ম্যাপ এঁকে দেবে?

—কোথাকার ম্যাপ?

—ইন্ডিয়ার ম্যাপ।

—এখুনি চাই?

—হ্যাঁ, এখুনি চাই।

—কাল সকালে আসিস। এখন ইচ্ছে করছে না।

—এখনই দাও না! খুব দরকার।

অপূর্বকে তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর মা বলেন, চৈতি এত করে বলছে আর তুই একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারছিস না।

উনি একটু থেমে বলেন, তুই ম্যাপ এঁকে দিতে দিতেই আমার ভাত হয়ে যাবে। তখনই তোকে খেতে দেব।

অপূর্বর পিছন পিছন চৈতালী ওর পড়ার ঘরে ঢুকেই বলে, চিঠিতে ওসব কথা লিখেছ কেন?

অপূর্ব এক গাল হাসি হেসে বলে, সত্যি তোকে খুব আদর করতে ইচ্ছে করে।

চৈতালীও একটু হেসে বলে, আমি কি বাচ্চা মেয়ে যে আমাকে কোলে নিয়ে আদর করবে?

অপূর্ব ডান হাত দিয়ে ওর গাল টিপে বলে, তুই দিন দিন যা হচ্ছিস না!

—দিন দিন কি হচ্ছি?

—টোপা কুলের মত মিষ্টি হচ্ছিস।

এইটুকু বলেই চৈতালী আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, এই অপূর্বই আমার প্রথম প্রেমিক।

—দ্বিতীয় প্রেমিক কে?

ও বেশ গম্ভীর হয়ে বলে, হবিগঞ্জে থাকার শেষের দিকে আমি আরো চার-পাঁচজনের কাছ থেকে প্রায়ই প্রেমপত্র পেতাম। তার মধ্যে নুরুল বলে একটা ছেলে সব সময় কবিতায় চিঠি লিখতো।

—আর অন্যরা?

—মানিক বলে একটা ছেলে ভীষণ অসভ্য চিঠি লিখতো।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

—সেও কি অপূর্বর বয়সী ছিল?

—না, না, ওর চাইতে বেশ বড় ছিল। ছেলেটা লেখাপড়া স্ট্যান্ড না করলেও বেশ ভাল ছিল। তাছাড়া খুব ভাল ভাটিয়ালী গাইতে পারতো বলে আমার ঠাকুমা ওকে খুব ভালবাসতেন।

চৈতালী একটু হেসে বলে, ঐ মানিকদার চিঠি পড়েই আমি প্রথম জানতে পারি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা কি।

আমি হাসতে হাসতে বলি, এই মানিক তাহলে সত্যিকার মানিক!

চৈতালী আমার কথা শুনে হাসে। তারপর বলে, শুধু অল্প বয়সী ছেলেরা না, বেশি বয়সের পুরুষরাও যে আমাকে চায়, তা কবে বুঝলাম জানো?

—কবে?

—কলকাতায় আসার পরে।

ও একটু থেমে বলে, লিলিদি বলে এক দিদিমণির কাছে আমি পড়তে যেতাম।

আমি চুপ করে ওর কথা শুনি।

—লিলিদি যেমন আমাকে ভালবাসতেন, সেইরকমই ভাল পড়াতেন। ওর স্বামী সুজিতকাকুও আমাকে খুবই স্নেহ করতেন।

চৈতালী একটু হেসে বলে, অন্য দিনের মত সেদিনও পড়তে গিয়েছি। আমাকে দেখেই লিলিদি বললেন, চৈতি, আমার দিদি বেশ অসুস্থ। আমি ওকে দেখতে যাচ্ছি। আজ তুই তোর কাকুর কাছেই পড়।

—তোমার ঐ লিলিদি আর সুজিতকাকু দু'জনেই কি টিচার ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—যাইহোক বলো।

ও একটু মুচকি হেসে বলে, সেদিন সুজিতকাকু আমাকে ঘোড়ার ডিম পড়ালেন। লিলিদি চলে যেতেই উনি আমাকে কোলে বসিয়ে শুধু আদর করলেন আর বার বার চুমু খেলেন।

—তুমি আপত্তি করলে না?

—সত্যি কথা বলতে কি, আমার ভালোও লেগেছিল, মজাও লেগেছিল, আবার অবাকও হয়েছিলাম।

চৈতালী মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তবে সেই দিনই আমি প্রথম বুঝতে পারি, আমার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে, যা সব বয়সের পুরুষকেই আকর্ষণ করে।

এইসব কথাবার্তার মাঝখানেই মঙ্গল সিং আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায়। ব্রেকফাস্টের শেষ পর্বে কফির কাপে চুমুক দিয়েই জিজ্ঞেস করি, তুমি স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছিলে?

—না।

—ফেল করেছিলে?

—না! পরীক্ষা দিইনি। মানে দিতে পারিনি।

—কেন?

আমি ক্লাশ নাইনে ওঠার পর পরই হঠাৎ আমার মা মারা গেলেন। হবিগঞ্জ থেকে বড় জ্যাঠা আর ছোট মা এলেন আমার দেখাশুনার জন্য কিন্তু ছ'মাসের মধ্যে বড় জ্যাঠাও মারা গেলেন।

চৈতালী একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, তার কিছুদিনের মধ্যেই হবিগঞ্জ থেকে খবর এলো, ছোট জ্যাঠা অফিসে কাজ করার সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবার পর থেকেই বেশ অসুস্থ। তখন ছোট মা বাধ্য হয়ে হবিগঞ্জে ফিরে গেলেন।

—এইসব কারণে তোমার পড়াশুনাই বন্ধ হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, আমি তখন বর্ধমানে বাবার কাছে চলে গেলাম।

—তুমি কি প্রেম করে বিয়ে করেছিলে?

ও হাসতে হাসতে বলে, না, না, সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয়। আমাকে দেখেই পাত্রপক্ষ গলে গিয়েছিল।

—তাই নাকি?

—সত্যি বলছি।

চৈতালী মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তখন বাবা সবে রিটায়ার করেছেন। আমি আর বাবা বাগবাজারের বাড়িতে থাকি। ছোট মা'র মাসতুতো বোনের মেয়ের বিয়েতে বাবা আর আমি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছি। হঠাৎ একজন বয়স্কা মহিলা এক গাল হাসি হেসে আমার কাছে এগিয়ে এলেন।..

—কি নাম তোমার?

—চৈতালী সরকার।

—যার বিয়ে হচ্ছে সে তোমার কে হয়?

চৈতালী একটু ভেবে বলে, আমার দূর সম্পর্কের মাসীর মেয়ে।

তোমার মা-বাবাও এসেছেন?

-আমার মা নেই, বাবার সঙ্গেই আমি এসেছি।

—তোমার বাবার নাম কি?

—শ্রীনরেশচন্দ্র সরকার।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—সিলেটের হবিগঞ্জ।

ঐ মহিলা মুহূর্তের জন্য ভেবেই প্রায় করেন, নগেন সরকার কি তোমার কেউ হন?

—উনি আমার বড় জ্যাঠা ছিলেন।

মহিলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, ছিলেন মানে?

—বছর দুয়েক আগে বড় জ্যাঠা মারা গিয়েছেন।

—ইস! খুবই দুঃখের কথা।

উনি একটু থেমেই বললেন, তোমার বাবা কোথায়?

চৈতালী এদিক-ওদিক দেখেই ডান হাত দিয়ে পাশে চেয়ারে বসা লোকজনদের দেখিয়ে বলে, একেবারে সামনের সারির ডান দিকে কালো চশমা চোখে যে ফর্সা...

—ও হ্যাঁ, বুঝেছি।

সেই রাত্রেই বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে এসে নরেশবাবু মেয়েকে বললেন, মৈমনসিং এর বিখ্যাত জমিদার রায় বাড়ি থেকে তোর বিয়ের প্রস্তাব এসেছে।

উনি একটু থেমে হাসতে হাসতে বলেন, তোকে দেখে ছেলের মা'র এতই পছন্দ হয়েছে যে সম্ভব হলে তখনই তোর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেন।

চৈতালী কি বলবে? চুপ করে থাকে।

নরেশবাবু জামাকাপড় বদলে ইজিচেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বলেন, ছেলেটিকেও দেখলাম। সাক্ষাৎ রাজপুত্তুর।

উনি প্রায় না থেমেই বলেন, ঐ রকম বড়লোকের বাড়িতে তোর বিয়ে দেবার কথা তো আমি ভাবতেই পারি না কিন্তু ওরা তো ন্যাছোড়বান্দা। আর মনে হয়, তোকে দেখে ছেলেরও খুব পছন্দ হয়েছে।

এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর চৈতালী বলে, ঐ মহিলা কি বড় জ্যাঠাকে চিনতেন?

—হ্যাঁ।

নরেশবাবু একটু থেমে বলেন, মৈমনসিং'এর রাজা কিরণশঙ্কর হাইস্কুল ঐ মহিলার শ্বশুরই প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর বাবার স্মৃতিতে। বড়দা প্রথম জীবনে

ঐ স্কুলেই টিচার ছিলেন। তাছাড়া উনি রাজবাড়ির ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউটরও ছিলেন।

উনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, বড়দা বেঁচে থাকলে এই বিয়ের ব্যাপারে তিনি এক মুহূর্তও দ্বিধা করতেন না।

চৈতালী সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বলল, ঐ বিয়েবাড়ি থেকে আসার ঠিক আঠারো দিনের দিন রাজা কিরণশঙ্কর রায়ের নাতি দেবেন্দ্রশঙ্করের একমাত্র ছেলে উদয়শঙ্করের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।

—তখন তোমার কত বয়স?

—আঠারো পূর্ণ হয়ে সবে উনিশে পড়েছি।

এ একটু হেসে বলল, এই হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম পর্ব।

দু'পাঁচ মিনিট সিগারেট টানতে টানতে আপন মনে চিন্তা করি। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, হবিগঞ্জের যেসব ছেলেরা তোমাকে প্রেমপত্র লিখতো, ভালবাসতো বা সুজিতকাকুর সঙ্গে পরে তোমার দেখাশুনা হয়েছে?

চৈতালী মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, দু'একজনের সঙ্গে হয়েছে।

—কার সঙ্গে?

—আমার প্রথম প্রেমিক অপূর্বর সঙ্গে।

—কোথায়? কবে?

—বলছি।

ও একটু থেমে বলে, আমার একটু নাম হবার পর থেকেই আমার কাছে বেশ চিঠিপত্র আসতে শুরু করল। তখন ঐসব চিঠিপত্র পড়তে বেশ ভাল লাগতো। প্রায় সব চিঠিতেই আমার রূপ আর অভিনয়ের প্রশংসা। কেউ কেউ আমার একটা ছবি বা অটোগ্রাফ চাইতেন। দু'একজন টাকাকড়িও চাইতেন পড়াশুনা বা অসুখ-বিসুখের খরচ চালাবার জন্য।

—তুমি চিঠির উত্তর দিতে?

—না।

—কেন?

—একে আমার হাতের লেখা খারাপ, তাছাড়া সময়ও হতো না।

—কাউকে সাহায্যও করতে না?

—বুড়ো-বুড়ীরা চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইলে কিছু কিছু সাহায্য করতাম।

—হ্যাঁ, বলে যাও।

চৈতালী একটু থেমে বলে, যখনকার কথা বলছি, তখন আমার বৃহস্পতি তুঙ্গে। যত বাজে ছবিতেই অভিনয় করি না কেন, সবই সুপার হিট হচ্ছে। প্রডিউসার ডিরেক্টররা আমাকে নায়িকা করার জন্য সকাল-সন্ধেয় আমার বাড়িতে লাইন লাগাচ্ছে। টাকাকড়ি বা অন্য যে কোন ব্যাপারে যত অন্যায় দাবীই করি না কেন, ওঁরা হাসি মুখে মেনে নিচ্ছেন। এক চঞ্চল ছাড়া সব আর্টিস্টরাই আমাকে ভয় করে।

ও একটু হেসে বলে. চঞ্চলও যে মনে মনে আমাকে ঈর্ষা করে, তাও বুঝতে পারি।

আমি মুখ টিপে হাসি।

চৈতালী একটু হেসে বলে, সেই সময় একদিন সকালে ড্রইংরুমে বসে দু'চারজন ডিরেক্টর-প্রডিউসারের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় শেফালী এসে আমার কানে কানে...

—শেফালী কে?

—শেফালী আমার বাড়িতেই কাজ করে।

ও প্রায় না থেমেই বলে, আমি কখনই টেলিফোন ধরি না। শেফালীর এক মাত্র কাজ টেলিফোন ধরা। সবাইকেই ও বলে, ধরুন ; দেখছি উনি আছেন কি না। তারপর কদাচিৎ কখনও আমি টেলিফোন ধরি। না ধরতে চাইলে ও বলে দেয়, উনি এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন।

আমি একটু হেসে বলি, চমৎকার।

—যাইহোক শেফালী আমার কানে কানে বলল, আপনার ছোটবেলার বন্ধু অপূর্ব ফোন করছেন। কি বলব?

মুহূর্তের জন্য চৈতালীর মনে হয়, কথা বলবে না। কি হবে কথা বলে? হয়তো দু'চারটে সেন্টিমেন্টাল কথা বলে টাকাকড়ি চাইবে। যদি বেকার হয়, তাহলে হয়তো বলবে, যেখানে হোক একটা কাজকর্মের ব্যবস্থা করে দাও।

তারপর আবার পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করেই চৈতালী উঠে যায়। টেলিফোনের রিসিভার তুলেই বলে, কে কথা বলছেন?

—চৈতি, আমি হবিগঞ্জের অপূর্ব। অপুদা।

চৈতালী একটু হেসে বলে, এতদিন পর মনে পড়লো?

অপূর্ব একটু হেসে বলে, কোন বাঙ্গালী তোমার কথা রোজ মনে করে না?

ও একটু থেমে বলে, অনেক কষ্টে তোমার টেলিফোন নম্বর জোগাড় করার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা চলে এসেছি। তুমি তো এখন আকাশের ধ্রুবতারা। আমি ভাবতেই পারছি না, তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছো।

অপূর্ব না থেমেই বলে, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি, তুমি আমাকে চিনতে পারবে।

—তুমি আজকাল কোথায় থাকো?

—আগরতলায়।

—কি করছো?

—একটা কলেজ লেকচারার। আর আগরতলার দুটো বিখ্যাত কাগজ দৈনিক সংবাদ আর ত্রিপুরা দর্পণে নিয়মিত লিখছি।

চৈতালী একটু ভেবেই বলে, আমার সঙ্গে দার্জিলিং যাবে?

—কবে?

—আজই।

ও একটু থেমে বলে, ওখানে আমার একটা ছবির আউটডোর আছে; আজ দার্জিলিং মেলে যাবো। ফিরব রবিবার সকালে।

—আমি গেলে তোমার কোন অসুবিধে হবে না?

—না, না, কিছু অসুবিধে হবে না।

—কিন্তু আজকের দার্জিলিং মেলে কি আমি রিজার্ভেশান পাবো?

—সেসব তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না।

—আমি তো কোন গরম জামা কাপড়ও আনিনি।

চৈতালী একটু হেসে বলে, আমার নানা ধরণের প্রচুর পুলওভার আছে।

তার থেকে তুমি দু'পাঁচটা বেছে নিও।

ও একটু থেমে বলে, আজ আউটডোরে যাবো বলে শুটিং ক্যানসেল করেছি। তুমি এখুনি আমার বাড়িতে চলে এসো। ড্রইংরুমে কয়েকজন প্রডিউসার-ডিরেক্টর বসে আছেন। আমি টেলিফোন ছাড়ছি।

রিসিভার নামিয়ে রেখেই চৈতালী শেফালীকে বলে, অপূর্ব আমার কাজিন ভাই। ছোটবেলায় আমাদের খুব বন্ধুত্ব ছিল। ও একটু পরেই আসবে। দারোয়ানকে বলবি, গেট খুলে দিতে। আর চাঁপাকে বল, গেস্ট রুম রেডি করতে।

শেফালী মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে না জানাতেই চৈতালী ড্রইংরুমে এসেই 'আমরা দু'জনে' ছবির প্রযোজক রাহাবাবুকে বলে, মাখনবাবু, আমার এক কাজিন ভাই আগরতলা থেকে এসেছে। আমি ওকে নিয়ে দার্জিলিং যাবো।

রাহাবাবু দন্ত বিকশিত করে বলেন, খুব ভাল কথা।

—ওর একটা টিকিট কেটে নেবেন।

—সেসব ব্যাপারে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

উনি সঙ্গে সঙ্গেই জিজ্ঞেস করেন, ম্যাডাম, আপনার ভাইয়ের জন্য কি হোটেলে একটা ঘর বুক করবো?

—না, না ; ট্রেনে আমার কুপেতেই ও যাবে, হোটেলেও আমার ঘরেই থাকবে।

চৈতালী আমার দিকে তাকিয়ে বলল, এত বছর পর অপুদাকে দেখে খুব ভাল লাগলো। ট্রেন ছাড়ার মিনিট দশেক আগে শিয়ালদা স্টেশনের ভি-আই-পি এনট্রান্সের সামনে আমার গাড়ি থামতেই আমার প্রডিউসার ডিরেক্টর ছাড়াও জি-আর-পি'র এস-পি, ও-সি আর পঁচিশ তিরিশজন আর্মড পুলিশ আমাদের দু'জনকে পাহারা দিয়ে ফার্স্ট ক্লাশ এ-সি'তে তুলে দিল।...

আমি একটু হেসে বলি, হাজার হোক উর্বশী দেবী যাচ্ছেন। এসব তো হবেই।

ও একটু হেসে বলে, ঐ কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়ল,

আমি দার্জিলিং মেলে যাচ্ছি। ব্যস! চোখের নিমেষে আমাদের কম্পার্টমেন্টের সামনে হাজার হাজার লোক জমে গেল। আমাকে একবার দেখার জন্য তাদের কি পাগলামী!

—তোমার মত সেক্সী নায়িকাকে দেখতে লোকে পাগলামী করবে না?

—আঃ! বাচ্চু! চুপ করো। যা বলছি শোনো।

—হ্যাঁ বলো।

—ট্রেন ছাড়তেই অপূর্ব বলল, চীফ মিনিস্টার গেলেও এত পুলিশ পাহারায় থাকতো না, এত লোকের ভীড়ও হতো না। এতদিন কাগজে পড়েছি কিন্তু আজ নিজের চোখে দেখলাম, তুমি কোথায় পৌঁছেছ!

—তারপর?

—প্রডিউসার স্কচের বোতল, এক কার্টুন বেনসন-হেজেস আর গ্রান্ডের খাবার দাবার ভর্তি হট কেস দিয়ে গেলেন।

আমি মুচকি হেসে বলি, তারপর?

—অপুদাকে হুইস্কী খাওয়ালাম, আমিও খেলাম।

—তারপর?

চৈতালী একটু এগিয়ে এসে আমার গালে আলতো করে একটা চড় মেরে বলল, যা ভাবছো, সেসব কিছুই হয়নি। অনেক রাত পর্যন্ত দু'জন গল্প করেছি।

ও একটু থেমে বলে, তবে দার্জিলিং-এ যে ক'দিন ছিলাম, সেই ক'দিনই আমরা চুটিয়ে এনজয় করেছি।

—তখন তোমার বয়স কত?

ও একটু ভেবে বলে, বোধহয় তিরিশ।

আমি একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে জিজ্ঞেস করি, হঠাৎ অপূর্বর প্রতি এত কৃপা করলে কেন?

—হঠাৎ ইচ্ছে হলো।

ও একটু থেমে বলে. আমি বরাবরই আদুরে ছিলাম। বাড়ির সবাই আমার আব্দার মেনে নিতো। সিনেমায় নামার পর হলাম খামখেয়ালী। যখন যা ইচ্ছে হয় তখন তাই করি। লোকেও হাসি মুখে আমার খামখেয়ালীপনা বরদাস্ত করে।

—তখন তোমার ডিভোর্স হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, অনেকদিন আগে।

চৈতালী একটু থেমে বলে, বিয়ের পাঁচ বছর পরই আমি উদয়কে ডিভোর্স করি।

—পুরনো দিনের পরিচিতদের মধ্যে পরে আর কার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—সুজিতকাকুর সঙ্গে।

ও একটু থেমে বলে, কোনার্কে আউট ডোর করতে গিয়ে হঠাৎ দেখি, ভীড়ের মধ্যে সুজিতকাকু দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ সিনটা টেক হবার পর পরই ওকে কাছে ডাকলাম।...

সুজিতবাবু কাছে আসতেই চৈতালী হেসে বলে, কাকু, বেড়াতে এসেছেন?

—হ্যাঁ।

লিলিদি কোথায়?

—তোমার লিলিদি স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে শিলং গিয়েছে।

উনি একটু থেমে বলেন, এত বছর পর তুমি আমাকে চিনতে পারলে কি করে?

চৈতালী ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, আমি জীবনেও আপনাকে ভুলব না।

—কেন?

—আপনিই প্রথম পুরুষমানুষ যে আমাকে আদর করেছে, চুমু খেয়েছে। আপনাকে কি ভুলতে পারি?

চার

সন্ধের পর হুইস্কীর আসরে দু'এক গেলাস পেটে পড়ার পরই চৈতালী বলল, বাচ্চু, এবার তোমাকে আমি আমার স্বামী আর শ্বশুরবাড়ির গল্প করবো।...

বেশ জাঁকজমক করেই বৌভাত হলো। হীরা, জড়োয়া, মুক্তোর গহনা

পরে বহু বনেদী বাড়ির মেয়ে-বউরা এলেন। এলেন চুনোট করা ধুতি আর সিল্ক বা গরদের পাঞ্জাবি পরা পুরুষের দল। এছাড়া প্যান্ট-সার্ট সুট-বুট পরা উদয়শঙ্করের বন্ধুরা। সবার মুখেই এক কথা, পরমাসুন্দরী বউ হয়েছে।

অতিথির দল কত রকমের কত কি উপহার দিলেন চৈতালীর হাতে। সেসব উপহার চৈতালী নিঃশব্দে তুলে দেয় বড় ননদ গায়ত্রীর হাতে। হ্যাঁ, শাশুড়িও জড়োয়ার সেট উপহার দিয়েছিলেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।

তারপর?

ফুলশয্যার জন্য একটু বেশি রাত করেই উদয়শঙ্কর ঘরে এসেই একটু হেসে বললেন, আমার বন্ধুরা তো তোমাকে দেখে মুগ্ধ। কেউ পরামর্শ দিল, তোমাকে মোনালিসা বলে ডাকতে ; কেউ বলল, তোমাকে গ্রেটা গার্বো বলে ডাকতে।

দু'হাত দিয়ে চৈতালীর মুখখানা তুলে ধীরে উদয়শঙ্কর জিজ্ঞেস করে, তুমি আমাকে কি বলে ডাকবে?

লজ্জায় চৈতালী মুখ নীচু করে।

—লজ্জা কি? আমি তো তোমার স্বামী।

তবু চৈতালী কিছু বলতে পারে না।

তারপর উদয়শঙ্করের পীড়াপিড়িতে ও অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বলে, আপনি যা বলবেন।

—স্বামীকে কেউ আপনি বলে?

উদয়শঙ্করই একটু থেমে বলে, তুমি আমাকে উদয় বলেই ডাকবে আর আমি তোমাকে সুন্দরী বলে ডাকব।

চৈতালী সলজ্জ দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে।

উদয়শঙ্কর দু'হাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চাপা গলায় বলে, অনেক রাত হয়েছে। এখান শোবে তো?

চৈতালী মাথা নেড়ে বলে, না।

—কেন?

চৈতালী কোন জবাব দেয় না। দিতে পারে না।

—কি হলো? বলো, শোবে না কেন?

তবুও ও নীরব থাকে। বলতে পারে না, শুতে যেতে ভয় করছে।

উদয়শঙ্কর ওর মুখের উপর মুখ রেখে বলে, সারারাত গল্প করবে?

দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর চৈতালী বলে, আপনি কথা বলুন; আমি শুনব।

উদয়শঙ্কর একটু হেসে বলে, ফুলশয্যার রাত্রে কি শুধু গল্প করে?

—না, না, প্লীজ!

আতঙ্কিত চৈতালী ওর হাত দুটো চেপে বলে।

চৈতালী আবার গেলাসে হুইস্কী ঢালে, জল মেশায়, চুমুক দেয়। তারপর বলে, বিশ্বাস করো বাচ্চু, বছরখানেক উদয় আনন্দে ভালবাসায় আমাকে ভরিয়ে দিয়েছে। ওকে নিয়ে আমি সত্যি সুখী হয়েছিলাম।

ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে ও বলে, কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম ও বুঝলাম।

—অনেক কিছু মানে?

—এক কালে ওরা বিরাট জমিদার ছিল। লেকের কাছে রাজা বসন্ত রায় রোডের যে বাড়িতে আমরা থাকতাম, সেটাও বিশাল বড় বাড়ি ছিল। ছিল মেহগনির ফার্নিচার, ঝাড়লণ্ঠন, বাঘের ছাল, বাইসনের মাথা কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারতাম, এদের বিশেষ টাকাকড়ি নেই।

—উদয়বাবু কি করতেন?

—ঘোড়ার ডিম করতো।

—তার মানে?

—ওর বাপ-ঠাকুর্দা চোদ্দ পুরুষ যেমন চাকরি-বাকরি ব্যবসা-বণিজ্য করেনি, সেইরকম উদয়ও ওসব কিছু করতো না।

আমি অবাক হয়ে বলি, কিছুই করতেন না?

—না।

—উনি লেখাপড়া কত দূর করেছিলেন?

—ছোট ননদের কাছে শুনেছিলাম, ও কলেজে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু

কলেজে না গিয়ে শুধু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতো।

হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়ে দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর প্রশ্ন করি, তোমার শ্বশুরবাড়ির সংসার চলতো কি করে?

—কলকাতার নানা জায়গায় বেশ কয়েকটা বাড়ি ছিল। এ ছাড়া মধুপুর আর পুরীর সমুদ্রের ধারে দুটো বাড়ি ছিল। মধুপুরের বাড়িটা ছাড়া অন্য সব বাড়ি ভাড়া দেওয়া ছিল।

চৈতালী সিগারেট ধরিয়েই বলে, ঐ বাড়ি ভাড়ার আয় দিয়েই সংসার চলতো।

—ব্যাঙ্কে নিশ্চয় টাকা ছিল।

—এর-ওর কাছ থেকে শুনেছিলাম, পাকিস্তানের ঘরবাড়ি জমিজমা বিক্রি করে শ্বশুরমশাই বোধহয় কুড়ি-পঁচিশ লাখ টাকা পেয়েছিলেন। আমার বিয়ের সময় বোধহয় তার তলানি কিছু পড়েছিল।

—এই ধরনের পরিবারের তো প্রচুর সোনা-দানা থাকে।

—হয়তো ছিল কিন্তু আমি জানতাম না।

—তুমি ও বাড়ির বউ হয়েও কিছু জানতে না?

—না।

—তাহলে কে জানতো?

—সবকিছু জানতেন আমার শাশুড়ি আর ম্যানেজার কাকু।

—ওদের ম্যানেজারকে কাকু বলতে?

চৈতালী একটু হেসে বলে, ম্যানেজার কাকুই ছিলেন ও বাড়ির সর্বেসর্বা।

—তোমার শ্বশুর?

—তিনি সকাল-বিকেল একটু সরোদ বাজাতেন আর সন্ধের পর চার-পাঁচ পেগ ব্রান্ডি খেতেন। ব্যস! তাঁর আর কোন কাজ ছিল না।

ও সঙ্গে সঙ্গেই বলে, তবে আমি নিশ্চয়ই বলবো, ঐ ফ্যামিলীতে একমাত্র উনিই সত্যিকারের ভাল মানুষ ছিলেন। আমি যেমন শ্রদ্ধা করতাম, উনিও তেমনি আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন।

—আর তোমার শাশুড়ি?

চৈতালী আবার একটু হাসে। বলে, শাশুড়ির কথা বলতে হলে ম্যানেজার

কাকুর কথাও বলতে হবে।

আমি ভেবে পাই না। শাশুড়ির কথা বলতে হলে ম্যানেজারের কথাও কেন বলতে হবে। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও বলে, ওদের কথা বলতে হলে মহাভারত হয়ে যাবে। মোটমুটি ব্যাপারটা তোমাকে বলছি।

—হ্যাঁ, সংক্ষেপেই বলো।

—ম্যানেজারকাকু আমার শ্বশুর মশায়ের চাইতে বছর পাঁচেকের ছোট হলেও বিশেষ বন্ধু। আমার শ্বশুরবাড়ির টাকাতেই শ্বশুরবাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছেন। আমার শ্বশুরমশায়ের টাকাতেই উনি কলকাতায় মেসে থেকে ল' পাশ করেন।

—ল' পাশ ছিলেন বলেই বোধহয় ওকে ম্যানেজার করা হয়?

—আট আনা সেই কারণে, আট আনা বন্ধুত্বের জন্য।

ও একটু থেমে বলে, আমার শ্বশুরমশাই যেমন নিরীহ গোবেচারা ধরনের, ম্যানেজার কাকু ঠিক তার বিপরীত। ভদ্রলোককে দেখতে যেমন সুপুরুষ, সেইরকম ব্যক্তিত্ব। তাঁর হাবভাব চালচলন দেখলে তোমার মনে হবে, তিনিই জমিদার, শ্বশুরমশাই তাঁর আশ্রিত।

চৈতলী হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, রায় পরিবারের আসল মলিক হচ্ছেন ম্যানেজার কাকু আর শাশুড়ি। দু'জনের মধ্যে দারুণ ভাব ভালবাসা।

আমি একটু হেসে বলি, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে, ঐ দু'জনের মধ্যে খুবই স্পেশ্যাল ভাব-ভালবাসা?

—ঠিক ধরেছ।

ও না থেমেই বলে, উদয়ের ছোটবোনকে দেখতে তো ঠিক ম্যানেজার কাকুর মত।

—বলো কি!

—না হবার তো কারণ নেই। বিষয়-সম্পত্তি দেখাশুনা মেরামত ইত্যাদি করার নাম করে ওরা দু'জনে তো হরদমই পুরী বা মধুপুর যেতেন।

চৈতালী একটু হেসে বলে, সব চাইতে মজার কথা হচ্ছে, ঐ মেয়েটাই ম্যানেজার কাকুকে সব চাইতে বেশি ঘেন্না করে, সমালোচনা করে।

—মাই গড!

—ঐ বাড়িতে শুধু ঐ মেয়েটাই আমার বন্ধু ছিল ও এখনও আমরা দু'জনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ও সিগারেট ধরিয়ে বলে, ঐ ফ্যামিলীতে ঐ মেয়েটাই একমাত্র গ্রাজুয়েট। নিজে পছন্দ করে একটা ছেলেকে বিয়ে করেছে রেজেস্ট্রী করে।

—মেয়েটার তো যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে।

—ওর বিয়েতে কে কে সাক্ষী ছিল জানো?

—কে কে?

—আমি, আমার শ্বশুরমশাই আর ওর এক পুরনো মাস্টারমশাই।

—বিয়েতে তোমার স্বামী, শাশুড়ি বা বড় ননদ উপস্থিত ছিলেন?

—হ্যাঁ, সবাই ছিলেন কিন্তু কারুর কাছ থেকে কোন উপহার নেয়নি।

—ভেরি গুড!

আমাদের হুইস্কীর গেলাস খালি হয়, আবার ভরা হয়। আমরা দু'জনেই গেলাসে চুমুক দিই।

আমি বলি, তোমার শ্বশুরবাড়ির গল্প আর শুনতে চাই না। তুমি তোমার স্বামী আর সিনেমায় নামার কথা বলো।

চৈতালী শুরু করে, একে বয়স অল্প ছিল, তারপর নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে বলে প্রথম দিকে বিশেষ কিছু বুঝতে পারতাম না। উদয় যা বলতো, তাই বিশ্বাস করতাম। বছরখানেক পর থেকেই একটু একটু করে বুঝতে শুরু করলাম।

—কি বুঝতে শুরু করলে?

—প্রথম কথা, আমার ঐ ছোট ননদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম, উদয় যাতে বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে মাথা না ঘামায় সেজন্য ম্যানেজার কাকু ওকে নিয়মিত টাকাকড়ি দিয়ে খুশি রাখেন; তাছাড়া ও যাতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গল্পগুজব আড্ডা দিতে পারে, তার জন্য ওদের কালীঘাটের বাড়ির একটা ফ্ল্যাটও ওকে দেওয়া হয়েছিল।

—শুধু ম্যানেজার কাকুর কথায় নিশ্চয়ই এসব হয়নি। তোমার শাশুড়িও নিশ্চয়ই তা সমর্থন করতেন?

—একশ বার। ওঁরা নিজেদের স্ফূর্তির জন্যই ছেলেকে অধঃপাতে যাবার

সব ব্যবস্থা করেছিলেন।

চৈতালী মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, উদয়ের সঙ্গে বছরখানেক ঘর করার পর বুঝলাম, ও রোজ নেশা করে বাড়ি ফেরে। তাছাড়া ও যখন-তখন সাত-দশ দিনের জন্য আমাকে বাবার কাছে দিযে আসতে শুরু করলো। প্রথম দিকে বেশ ভালই লাগতো। কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতো, বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে।

—তারপর?

—তারপর হঠাৎ একদিন নেশার ঘোরে আমাকে বলল, রাখী আর বুলবুল আমাকে কি দারুণ আনন্দ দেয় আর তুমি শালী যেন বিন্দাবনের বিধবা বুড়ী!

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কথাটা শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল।

—ওরা কারা?

—তখন জানতাম না কিন্তু পরে জানতে পারি, ফিল্ম লাইনের কিছু লোকের সঙ্গে উদয়ের বন্ধুত্ব আছে। সপ্তাহে এক আধদিন ওরা উদয়ের পয়সায় মদ খাবার জন্য ওরা কালীঘাটের ফ্ল্যাটে যখনই আসতো, তখনই ফিল্মের একটা না একটা এক্সট্রা মেয়েকে ধরে আনতো উদয়কে খুশি করার জন্য।

—এসব তুমি কবে জানতে পারলে?

—অনেক পরে ; আমি ফিল্মে নামার পর।

—তুমি হঠাৎ ফিল্মে নামলে কেন?

—আমি তো স্বপ্নেও কোনদিন ভাবিনি, সিনেমায় অভিনয় করবো। উদয়ের জন্যই আমি এই লাইনে আসি।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

চৈতালী একটু থেমে বলে, বিয়ের বছরখানেক পর থেকেই উদয় কখনও কখনও বন্ধুবান্ধবদের পার্টিতে আমাকে নিয়ে যেতো। দেখতাম, ওর সঙ্গে পুলিশ অফিসার, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়, সিনেমা-থিয়েটার

লাইনের লোকজন থেকে আরো কত ধরনের লোকজনের সঙ্গে ওর পরিচয় ও বন্ধুত্ব।

—তার মানে খুবই মিশুকে ছিল?

—হ্যাঁ, খুবই মিশুকে ছিল।

ও একটু থেমে বলে, খুবই স্বাভাবিকভাবে ঐসব পার্টিতে ছবি তোলা হতো। উদয় পরে আমাকে বলতো, তোমার ছবি দেখে আমার ফিল্ম লাইনের বন্ধুরা খুবই প্রশংসা করে।

—প্রথম অফার কবে এলো?

—আমাদের থার্ড ম্যারেজ অ্যানিভার্সারীর দিন উদয় গ্রেট ইস্টার্নে একটা পার্টি ছিল। সে পার্টিতে শুধু ওর বন্ধুবান্ধব পরিচিতরাই এসেছিলেন।...

উদয়শঙ্কর এক গাল হাসি হেসে অতিথিদের অভ্যর্থনা করেই বলে, এসো, দেবুদা। মালাবৌদি, তুমি এসেছ বলে খুব খুশি হয়েছি।

ও চৈতালীকে বলে, তুমি তো দেবুদাকে চেনো। এই দেবুদার জন্যই আমি ক্লাব হাউসে বসে টেস্ট ম্যাচ দেখি। আর মালাবৌদি এক কালে ব্যাডমিন্টনে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ান ছিলেন।

চৈতালী হাসিমুখে ওদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করে।

পর পর অতিথিরা আসেন। উদয়শঙ্কর তাদের পরিচয় করিয়ে দেন চৈতালীর সঙ্গে... এই হচ্ছে পি. কে। দ্য গ্রেট পি. কে. ব্যানার্জী। ভারতবর্ষের অন্যতম গ্রেটেস্ট ফুটবলার।... আরে ধনঞ্জয়দা, আপনি যে রেকর্ডিং শেষ করে আসতে পারবেন তা আমি ভাবতে পারিনি।... আরে বিমলদা, এসো, এসো। শুটিং শেষ করে এসেছ নাকি আবার স্টুডিওতে ছুটতে হবে?...

তারপর আরো কত অতিথির আগমন হয়।

ভদ্রলোককে দেখেই উদয়শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে, অমুদা, আপনি এসেছেন বলে দারুণ খুশি হয়েছি।

উনি পাশ ফিরে স্ত্রীকে বলেন, চৈতালী, ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর অমিয় সেন। আমার অমুদা।

চৈতালী মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে দু'হাত জোড় করে নমস্কার করে।

অমিয়বাবু ওর দিকে তাকিয়ে যেন সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি গুটিয়ে নেন না। চৈতালী একটু সলজ্জ হাসি হেসে দৃষ্টি গুটিয়ে নেয়।

পার্টি চলে। সব পুরুষদের হাতেই হুইস্কির গেলাস; মেয়েদের হাতে সফট্ ড্রিঙ্ক। ওয়েটারবা সামনে এসে ট্রের ধরলে ওরা এটা-ওটা মুখে দেন। উদয়শঙ্কর ঘুরে-ফিরে তদারক করতে করতেই টুকটাক কথাবার্তা হাসিঠাট্টা করেন। চৈতালীও অতিথিদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে কথাবার্তা বলেন। তারপর ও হঠাৎ খেয়াল করে, অমিয় সেন যেন সব সময়ই শুধু ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। অন্য কোন অতিথির দিকেই তাঁর খেয়াল নেই।

চৈতালী অস্বস্তিবোধ করে কিন্তু মুখে কিছু বলে না, বলতে পারে না।

তারপর এক সময় পার্টি শেষ হয়। একে একে অতিথিরা বিদায় নেন। অমিয় সেন তখনও হুইস্কির গেলাস সামনে রেখে মনে মনে কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করছেন। তারপব একবার মুখ তুলে দেখলেন সব অতিথিরা বিদায় নিয়েছেন।

এই উদয়, তোরা দু'জনে আমার কাছে আয়।

উদয়শঙ্কর আর চৈতালী সামনে বসতেই উনি এক মুহূর্তের জন্য চৈতালীর মুখের দিকে তাকিয়েই বললেন, দ্যাখ উদয়, আমি যদি তোর বউকে আমার সামনের ছবিতে হিরোইন করি, তুই মত দিবি?

ভদ্রলোকের কথা শুনে চৈতালীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে।

উদয়শঙ্কর চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, অমুদা, আপনি সিরিয়াসলি বলছেন?

উনি একটু মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, সত্যি বলছি চৈতালীকে আমি আমার ছবিতে হিরোইন করতে চাই। তুই মত দিলে আমি কাল সকালেই প্রডিউসারকে নিয়ে তোদের বাড়ি গিয়ে কনট্রাক্ট সই করিয়ে অ্যাডভান্স দিয়ে আসব।

উদয়শঙ্কর পাশ ফিরে একবার চৈতালীকে দেখেই বলে, অমুদা, ও কি পারবে?

চৈতালী মুখ নীচু করে বলে, আমি কোনদিন অভিনয় করা তো দূরের কথা, স্টেজেও উঠিনি।

উদয়শঙ্কর আবার বলে, স্টুডিওতে অত লোকজন, অত আলো, ক্যামেরা, মাইক্রোফোন, মানে এই সবকিছু দেখেই তো ও ঘাবড়ে যাবে।

অমিয়বাবু হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়ে একটু হেসে বললেন, সে সব দায়িত্ব আমার।

উনি চৈতালীর দিকে তাকিয়ে বলেন, অনেক নতুন ছেলে মেয়েকে নিয়েই তো আমি ছবি করেছি। সেসব ছবি তো ফ্লপ করেনি। তাছাড়া তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তো বেশ সাকসেকফুলও হয়েছে।

উদয়শঙ্কর বা চৈতালী সঙ্গে সঙ্গে কোন কথা বলতে পারে না। চুপ করে থাকে। চিন্তা করে।

অমিয়বাবুই আবার বলেন, দ্যাখ উদয়, আমার স্থির বিশ্বাস, চৈতালীকে দিয়ে আমি ভাল কাজ করিয়ে নিতে পারবো। ও ঠিক পারবে।

শুধু এইটুকু বলেই উনি থামলেন না। হুইস্কির গেলাসে আবার একবার চুমুক দিয়ে বললেন, দ্যাখ উদয়, যদি তোদের দু'জনের মত থাকে, তাহলে আমি প্রডিউসারকে রাজি করাবো, পর পর পাঁচটা ছবির হিরোইন হবার জন্য চৈতালীর সঙ্গে কনট্রাক্ট করতে।

উদয়শঙ্কর অবাক হয়ে বলেন, কি বলছেন আপনি?

—দ্যাখ উদয়, এক একটা ছবি করতে প্রডিউসারকে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে হয় কিন্তু উনি সে টাকা খরচ করেন শুধু আমার উপর নির্ভর করে। আমার পক্ষে কি আজেবাজে কথা বলা সম্ভব?

অমিয় সেনের কথাবার্তা শুনে চৈতালী অবাক হয়ে ভাবে, উনি কিভাবে বুঝলেন, আমার দ্বারা ফিল্মে অভিনয় করা সম্ভব? কি আছে আমার মধ্যে? আমি মোটামুটি একটু সুন্দরী বলেই কি উনি আমাকে ওর ছবির নায়িকা করতে চান?

আবার মনে হয়, পর পর পাঁচটা ছবিতে আমি হিরোইন হলে তো আমি বিখ্যাত হয়ে যাবো। সব বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে। তাছাড়া সত্যি-সত্যিই যদি আমি ভাল অভিনয় করতে পারি, তাহলে তো আরো ছবি করবো। আমি অনেক টাকাও পাবো।

আবার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এই শ্বশুরবাড়িতেই বা আমার ভবিষ্যত কি?

ওরা নামেই জমিদার। নামেই তালপুকুর কিন্তু ঘটি ডোবে না। উদয় শিক্ষিতও না, পরিশ্রমীও না। আলালের ঘরের দুলাল। তাছাড়া মাতাল, চরিত্রহীন। আমাকে কি সারাজীবন ঐ শাশুড়ি আর ম্যানেজার কাকুর কৃপায় বেঁচে থাকতে হবে?

চৈতালী মুখ তুলে অমিয়বাবুকে বলল, আমি রাজি। আপনারা কাল সকালে আসবেন।

উদয়শঙ্কর খুশির হাসি হেসে বলল, পারবে তো চৈতালী?

—আমাকে তো উনি শিখিয়ে দেবেন। আমিও চেষ্টা করবো।

ও একটু হেসে বলে, অদৃষ্টে যা আছে, তাই হবে।

অমিয়বাবু হুইস্কীর গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন, দ্যাটস লাইক এ গুড গার্ল।

সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়েই চৈতালী সেটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বাচ্চু, সব মানুষের মনেই কোন না কোন সময় দপ্ করে আগুন জ্বলে ওঠে। তখন সে খুনও করতে পারে, আত্মহত্যাও করতে পারে; নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে, অপরের সর্বস্ব কেড়ে নিতেও পারে।

ও একটু থেমে বলে, এইরকম আগুন মনের মধ্যে দপ্ করে জ্বলে ওঠে বলেই রাজার দুলাল সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে পারেন, সেনাপতিরা প্রতিশোধ নেবার জন্য জীবন পণ করে যুদ্ধ করেন।

আমি অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

চৈতালী আমার হাতের উপর একটা হাত রেখে বলল, আমি আমার গুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি, সেই রাত্রে আমার মনের মধ্যেও সর্বস্ব পণ করে জীবন যুদ্ধে নেমে পড়ার জন্য আগুন জ্বলে উঠেছিল।

ও একটু হেসে বলল, সেদিন বাইশ বছর দেড় মাস বয়সের এই মেয়েটার মনে কে সাহস জুগিয়েছিল, তা জানি না। তবে আমার মনে হয়, শুধু বিধাতাপুরুষই এই সাহস জোগাতে পারেন; আর কেউ না।

পাঁচ

পরের দিন সকালে চৈতালী একটা বার্মিজ লুঙীর উপরে পাতলা ফিনফিনে টি-সার্ট পরে আমার ঘরে ঢুকেই হাসতে হাসতে বলল, বাচ্চু, সত্যি করে বলো তো, আমার জীবন কাহিনী তোমার কেমন লাগছে?

আমি কোনরকম ভাবাবেগ প্রকাশ না করে বললাম, তোমার মত সুন্দরী, সেক্সী, বিখ্যাত অভিনেত্রীকে দিনের পর দিন এমন কাছে থেকে দেখতে পাচ্ছি বলেই তো আমার প্রাণ মন জুড়িয়ে যাচ্ছে।

—ন্যাকামী না করে সত্যি করে বলো।

—আগে সব শুনি। তারপর আমি আমার মতামত জানাবো।

—তথৈ ব চ!

দু'জনে দুটো সিগারেট ধরালাম। দু'চার মিনিট কেউই কোন কথা বললাম না। তারপর আমি জিজ্ঞেস করি, পর পর পাঁচটা বইতে হিরোইন হবার কনট্রাক্ট সই করে প্রথম ছবির কাজ শুরু করলে?

—হ্যাঁ।...

—কত অ্যাডভান্স পেয়েছিলে?

—পাঁচ হাজার।

—এক একটা ছবির জন্য কত টাকার চুক্তি হলো?

—প্রথম ছবির জন্য পাঁচ হাজার। পরের তিনটে ছবিতে এক এক হাজার বেশি। পাঁচ নম্বর ছবির জন্য দশ হাজার।

একটু হেসে প্রশ্ন করি, ঐসব টাকা দিয়ে কি করলে?

ও একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, ঐ পাঁচটা ছবির একটি পয়সাও আমার হাতে আসে নি।

অবাক হয়ে বলি, কেন?

—সব টাকা উদয় নিয়েছিল।

—তুমি কিছু বলো নি?

—সেসব পরে বলব।

—তোমার শ্বশুর-শাশুড়ি সিনেমায় নামার পারমিশন দিয়েছিলেন?

—কনট্রাক্ট সই করার আগে উদয় তাঁদের কিছু জানাতে দেয় নি।

—কনট্রাক্ট সই করার পর তাঁদের জানিয়েছিলে?

—হ্যাঁ।

—কি তাঁদের প্রতিক্রিয়া হলো?

—সবকিছু শোনার পর শ্বশুরমশাই বললেন, তোমাকে সিনেমায় নামানোর ব্যাপারে তোমার স্বামীই যখন উৎসাহী, তখন আমি কেন আপত্তি করবো?

—আর শাশুড়ি ঠাকরুণ?

—তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। আমাকে যা তা অকথ্য-কুকথ্য ভাষায় গালাগাল দিলেন।

—তুমি কিছু বললে না?

—আমি শুধু বলেছিলাম, মা, আপনি শুধু শুধুই আমার উপর রাগ করছেন। আপনার ছেলে উৎসাহ না দিলে, মত না দিলে আমি কখনই সিনেমায় অভিনয় করতে রাজি হতাম না।

—তোমার বাবা তখন বেঁচে ছিলেন?

—হ্যাঁ।

—খবরটা জানার পর তিনি কি বললেন?

—বাবা বললেন, যখন বাবাজীবন মত দিয়েছেন, তখন আমি কি বলব? তবে তোকে বলছি, খ্যাতি-যশ-অর্থ যেন তোকে অমানুষ না করে।

এইসব কথাবার্তার মাঝখানেই মঙ্গল সিং কফি দিয়েছিল। সেই কফির কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বললাম, এবার তুমি তোমার ছবি করার কথা বলো।

—হ্যাঁ, শোনো।

কনট্রাক্ট সই হবার সঙ্গে সঙ্গেই প্রযোজক হরিপদ সাহা ব্রীফ-কেসের মধ্যে কাগজপত্রগুলো রেখেই একশ' টাকার পঞ্চাশ খানা নোট উদয়শঙ্করের হাতে দিয়ে বললেন, প্লীজ, একটু দেখে নিন।

উদয়শঙ্কর একটু হেসে বলেন, আপনিই তো দেখে দিলেন। আবার আমি কি দেখব?

সাহাবাবু একটু হেসে বলেন, আমারও তো ভুল হতে পারে। টাকাকড়ি

সব সময়ই দেখেশুনে নেওয়া ভাল।

উদয়শঙ্কর নোটগুলো গুনে পকেটে রাখতে রাখতে বলে, ঠিক আছে।

এবার অমিয় সেন হাতের ফাইলটা চৈতালীর হাতে দিয়ে বললেন, এটা চিত্রনাট্য। তুমি এটা বার বার পড়বে। খুব মন দিয়ে পড়বে। ভুলে যাবে তুমি উদয়ের স্ত্রী। মনে করবে, তুমি শিবতলা স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই চিত্তবাবুর মেয়ে।

চৈতালী এক মন দিয়ে ওর কথা শোনে।

—ঠিক এক সপ্তাহ পর থেকেই আমি তোমাকে শেখাবো, কিভাবে কি করতে হবে।

উদয়শঙ্কর প্রশ্ন করেন, আপনি কি আমাদের বাড়িতেই ওকে শেখাতে আসবেন?

—না, না ; হরিদার অফিসের তিনতলায় যে রিহার্সাল রুম আছে, সেখানেই চৈতালীকে যেতে হবে।

সাহাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। যদি সম্ভব হয়, আমি নিজে এসে নিয়ে যাবো।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে উদয়শঙ্করকে বলেন, আপনিও আসবেন।

ওরা চলে যাবার পর চৈতালী নিজের ঘরে ঢুকেই ফাইলটা খুলে দেখে, প্রথম পাতায় বড় বড় করে লেখা 'একটু ভালবাসা'।

চৈতালী পিঠে বালিশ দিয়ে বিছানায় আধ শোওয়া হয়ে চিত্রনাট্য পড়তে শুরু করে। প্রথম প্রথম বেশ অসুবিধে হয়। একটু খট্‌কা লাগে। গল্প-উপন্যাস পড়া অভ্যাস থাকলেও ও জীবনে কখনও নাটক পড়েনি। তবু পড়ে যায় কিন্তু একবার পড়ে গল্পটা ঠিক বুঝতে পারে না। আবার পড়ে। তিন-চারবার পড়ার পর গল্পটা বেশ ভাল লাগে।

রাত্রে উদয়শঙ্কর ফিরে এসেই বলে, সুন্দরী, চিত্রনাট্য কি পড়েছ?

—হ্যাঁ, পড়েছি।

—কেমন লাগলো?

—প্রথম দিকে ঠিক বুঝতে পারছিলাম না। তিন-চারবার পড়ার পর গল্পটা বেশ ভাল লাগলো।

—অমুদা যে মাস্টারের মেয়ের কথা বললেন, সেই চরিত্রটা কেমন?

—ছোট্ট শহরের মাস্টারের মেয়ে যেমন হয়, সেইরকমই।

উদয়শঙ্কর একটু হেসে বলে, আর নায়ক?

চৈতালী একটু হেসে জবাব দেয়, ঐ মাস্টার মশায়েরই এক ছাত্র।

দিনের পর দিন ঐ চিত্রনাট্য পড়তে পড়তে চৈতালীর হঠাৎ মনে পড়ে, বড় জ্যাঠার কথা, তাঁর ছাত্রদের কথা। মনে পড়ে অপুদার কথাও। শিবতলা স্কুলের অঙ্কের মাস্টার চিত্তবাবুও তো বড় জ্যাঠার মত ছাত্রদের ঠিক সন্তানের মতই স্নেহ করতেন। অঙ্কের ব্যাপারে কোন ভুল-ত্রুটি হয় না কিন্তু সংসারের অঙ্কশাস্ত্রে কি ভুলই করলেন!

এক সপ্তাহ পর সাহাবাবুর গাড়ি এলো। স্বামীর সঙ্গে চৈতালী গেল সাহাবাবুর ধর্মতলার অফিসে। প্রযোজক আর পরিচালক তাদের অভ্যর্থনা করলেন। চা-টা খেতে খেতে একটু-আধটু গল্পগুজব হলো। তার পরই অমিয় সেন উঠে দাঁড়িয়েই বললেন, চৈতালী, চলো আমার ঘরে।

উনি উদয়শঙ্করকে বললেন, তুই এখানেই হরিদার সঙ্গে গল্পগুজব কর।

প্রযোজক মশাই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনি আমার কাছেই আছেন। আপনি যান।

ঘণ্টা দেড়েক পর অমিয়বাবু চৈতালীকে নিয়ে সাহাবাবুর ঘরে ঢুকেই উদয়শঙ্করকে বলেন, অন্তত সাত-দশ দিন শুধু চৈতালীকেই আমি আলাদা করে দেখিয়ে দেব। তারপর অন্য আর্টিস্টদের সঙ্গে কবে রিহার্সাল হবে, তা পরে বলব।

সাহাবাবু চৈতালীর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলেন, প্রথম দিন রিহার্সাল দিয়ে কি মনে হচ্ছে?

চৈতালীও একটু হেসে জবাব দেয়, খুব ইন্টারেস্টিং।

উনি বেশ জোরের সঙ্গেই বলেন, একশ'বার ইন্টারেস্টিং! ইন্টারেস্টিং না হলে কি সারা পৃথিবীতে সিনেমা এত পপুলার হতো?

এইভাবে দু'তিন দিন চলার পরই চৈতালীকে নিয়ে তিনতলার রিহার্সাল রুমে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই অমিয়বাবু থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে বললেন, হ্যাঁরে উদয়, এখন তো অফিসে কেউ নেই। তুই ইচ্ছে করলে

হরিদার সঙ্গে গল্প করতে করতে দু'এক পেগ খেতে পারিস।

সাহাবাবু সঙ্গে সঙ্গে অমিয়বাবুর দিকে তাকিয়ে বলেন, উদয়বাবু যে আমাদের দলের লোক, তা তো আগে বলবেন। উনি শুধু শুধু এই ক'দিন বৈধব্য পালন করলেন।

উদয়শঙ্কর ওদের কথা শুনে হাসে।

অমিয়বাবু রিহার্সাল রুমে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বলেন, উদয় খানদানী জমিদার বাড়ির ছেলে। ওদের কৃপাতেই তো আমাদের মত প্রজারা এইসব সদ্‌গুণের অধিকারী হয়েছে।

না, রিহার্সালের পরই উদয়শঙ্কর স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি যায় না। সাহাবাবু আর অমুদার সঙ্গে আড্ডা দেয়, হুইস্কী খায়। চৈতালী চা-কফি খায়, ওদের কথা শোনে, মাঝে মধ্যে দু'একটা কথা বলে।

দশ দিন পর চৈতালীকে নিয়ে রিহার্সাল রুম থেকে এসেই অমিয় সেন হাসতে হাসতে প্রযোজককে বলেন, হরিদা, বাজি লড়বেন?

—কিসের জন্য বাজি লড়বো?

—আমি বাজি রেখে বলতে পারি, চৈতালীর জন্যই এই ছবি হিট করবে।

হরিবাবু অবাক হয়ে বলেন, এখনও অন্য আর্টিস্টদের সঙ্গে রিহার্সাল হলো না, শুটিং হলো না, তবু আপনি বলছেন...

প্রযোজককে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই উনি বলেন, হরিদা, দয়া করে ভুলে যাবেন না, আমার নাম অমিয় সেন।

হরিবাবু জিভ কামড়ে বলেন, ছি, ছি, তা বলবেন না। আপনি যে কত গুণী মানুষ, তা কি আমি জানি না। আর সে কথা জানি বলেই আপনার প্রতিটি কথা আমি মেনে চলি।

অমিয়বাবু এক গাল হাসি হেসে হরিবাবুর সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, আই নো দ্যাট হরিদা।

অমিয়বাবুর গেলাসে হুইস্কী ঢেলে দিয়েই হরিবাবু বললেন, তবে আমি কথা দিচ্ছি, যদি এই নতুন ম্যাডামের জন্য 'একটু ভালবাসা' হিট করে, তবে আপনাদের দু'জনকেই পাঁচ হাজার টাকা করে প্রাইজ দেব।

সঙ্গে সঙ্গে গেলাস তুলে বললেন, চিয়ার্স!

আমি একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করি, প্রথম দিন শুটিং করতে ভয় করেনি?

চৈতালী বলে, সেদিন বাড়ি থেকে বেরুবার সময়ই মন দমে গিয়েছিল।

—কেন?

—স্টুডিও রওনা হবার আগে শ্বশুর মশাইকে প্রণাম করতেই উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, জয়ী হও মা। শাশুড়িকে প্রণাম করতেই উনি বললেন, যাও, নটী বিনোদনী, যাও। আমাকে আর পেন্নাম করতে হবো না।

চৈতালী দুটো চোয়াল শক্ত করে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বিশ্বাস করো বাচ্চু, আমি চোখের জল ফেলতে ফেলতে গাড়িতে উঠেই মন-প্রাণ দিয়ে মা কালীকে বলেছিলাম, মা, আমি যেন এই ভদ্রমহিলার অহংকার আর অপমানের জবাব দিতে পারি।

আমি একটু হেসে বলি, সে শুভদিন তোমার জীবনে এসেছিল?

ও একটু মুচকি হেসে বলে, সে শুভদিন শুধু একদিন আসেনি; মাসের পর মাস, বছরের পর বছর এসেছে। ঐ অহংকারী মহিলা এখনও আমার মাসোহারার উপরই নির্ভর করে বেঁচে আছেন।

—বলো কি!

—হ্যাঁ, বাচ্চু, সত্যি কথাই বলছি।

ও একটু থেমে বলে, দ্যাখো বাচ্চু, আমি তোমার মত লেখাপড়াও করিনি, তোমার মত জার্নালিস্টও না। তোমার মত দেশ-বিদেশের রাজা-উজীরও দেখিনি, মানুষও দেখিনি। তবু সামান্য অভিনেত্রী হয়েও তো কম অভিজ্ঞতা হয়নি।

—সে তো একশ'বার সত্যি।

—এই পৃথিবী সব সহ্য করে কিন্তু বিনা কারণে মানুষকে অপমান করলে, তাচ্ছিল্য করলে, হেয় জ্ঞান করলে, তা কখনই সহ্য করে না।

চৈতালী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, একদিন না একদিন চাকা ঘুরবেই।

—ঠিক বলেছ। নিছক অহংকার আর দম্ভের জন্যই তো পুরনো গ্রীক আর রোমান সাম্রাজ্য পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে গেল।

ও সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়ে বলে, সেই প্রথম শুটিং করার দিন থেকে ফ্লোরে ঢোকার আগে আমি ফ্লোরের মাটি ছুঁয়ে প্রণাম করি। তখনকার দিনের এক বিখ্যাত অভিনেত্রী তাই দেখে এক প্রবীণ অভিনেতাকে বললেন, দ্যাখো, দ্যাখো, ছুঁড়িটার ন্যাকামী দেখো। ও কি ভেবেছে, স্টুডিও কালীঘাটের মন্দির?

—ঐ অভিনেতা কিছু বললেন না?

—উনি বললেন, মেয়েটা যদি প্রণাম করে মনে শান্তি পায় তো তোমার রাগ করার কি আছে? তুমি এইটুকু মেয়েকে হিংসে করো না।

শুনে আমি হাসি।

চৈতালী একটু হেসে বলে, এর পরদিন থেকে ঐ অভিনেতাকে আমি যখন যেখানে দেখেছি, তখনই প্রণাম করেছি। উনি আমাকে মা বলে ডাকতেন বলে আমি ওঁকে বাবা বলে ডাকতাম।

—আর ঐ বিখ্যাত অভিনেত্রী?

—উনি সিনেমায় নামার পরদিন থেকেই বোধহয় একজন না একজনের রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটাতেন। তারপর যখন রূপ-যৌবন চলে গেল, মধু ফুরিয়ে গেছে বলে বাবুরা ওকে ত্যাগ করলেন, ছবির কাজ বন্ধ হয়ে গেল, তখন একদিন উনি আমার আলিপুরের বাড়িতে এসে হাজির।...

সেদিন রবিবার। সকালবেলায় ডজন খানেক প্রযোজক আর পরিচালক এসেছিলেন নতুন ছবির প্রস্তাব নিয়ে। তাদের বিদায় করতে করতে এগারটা বেজে গেল। তারপর চৈতালী লিভিংরুমের ডিভানে শুয়ে শুয়ে একটা চিত্রনাট্য পড়ছিল।

হঠাৎ শেফালী এসে পাশে দাঁড়াতেই চৈতালী বেশ বিরক্ত হয়ে বলে, দেখছিস না আমি স্ক্রীপট পড়ছি? যার টেলিফোনই আসুক, আমি এখন কথা বলতে পারবো না।

—না দিদি, টেলিফোন না।...

—তবে?

—দারোয়ান এসে খবর দিল, কে এক মায়া দেবী এসেছেন। উনি নাকি

সিনেমা করতেন। খুব জরুরী দরকার।

তিড়িং করে লাফ দিয়ে উঠে বসেই চৈতালী বলে, তুই নীচে যা তো। যদি দেখিস ঐ মহিলার বাঁ দিকের গালে একটা বেশ বড় তিল আছে, তাহলে উপরে নিয়ে আসিস। তা না হলে দারোয়ান যেন ঢুকতে দেয় না।

কয়েক মিনিট পর শেফালীর পিছন পিছন মায়া দেবী ঘরে ঢুকতেই চৈতালী তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। প্রণাম করে। বলে, দিদি, একি চেহারা তোমার?

—আর ভাই, বলো না। বড়ই দুঃখ-কষ্টে আছি।

শেফালীকে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই চৈতালী বেশ বিরক্ত হয়েই বলে, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? চাঁপাকে বল, তাড়াতাড়ি এক গেলাস ফ্রুট জুস দিতে।

শেফালী ঝড়ের বেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। কয়েক মিনিট পর নিজেই ফলের রসের গেলাস ট্রে'র উপর বসিয়ে প্লেট দিয়ে ঢেকে এনে মায়া দেবীর সামনে রাখে।

চৈতালী বলে, দিদি, আগে গেলাসে চুমুক দিন।

মায়া দেবী গেলাসে চুমুক দিতেই ও শেফালীকে বলে, দিদি খেয়েদেয়ে যাবেন। চাঁপা যেন ঠিক মত রান্নাবান্না করে।

শেফালী খালি গেলাস নিয়ে চলে যাবার পর মায়া দেবী চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলেন, দেখছি, তুমি সত্যি মহারানীর মত আছো।

—দিদি, যে স্টুডিও'র ধুলোবালি ভর্তি ফ্লোরে দাঁড়িয়ে টিনের চালের নীচে কাজ করি, সবই ঐ মন্দিরের কৃপায়।

—হ্যাঁ, ভাই, তুমি সত্যি দেখিয়ে দিলে, স্টুডিওকে মন্দির মনে করে কাজ করলে কি অসাধ্য সাধন করা যায়।

—দিদি, যে যেখানে কাজ করবে, সেই জায়গাকেই তো মন্দির মনে করা উচিত?

মায়া দেবী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন, কিন্তু আমরা তো মনে করতাম, স্টুডিও হচ্ছে লুটপাট করে টাকা রোজগার আর স্ফূর্তি করার জায়গা।

যাইহোক, চৈতালী অভাবনীয়ভাবে মায়া দেবীকে আদর-আপ্যায়ন করে

শেফালীকে বলে, আলমারী থেকে শ' পাঁচেক টাকা এনে দিদিকে দে। তারপর তুই নিজে আমার গাড়িতে দিদিকে পৌঁছে দিবি।

শেফালীর কাছ থেকে টাকাটা হাতে নিয়ে মায়া দেবী চৈতালীর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, তুমি যে কি উপকার করলে, তা বলে বোঝাতে পারবো না।

মায়া দেবী সেদিনের মত বিদায় নিলেও আবার মাস তিনেক পর হাজির।

চৈতালী গম্ভীর হয়ে শেফালীকে হুকুম করে, আলমারী থেকে এক শ' টাকা এনে দিদিকে দে।

শেফালী টাকাটা মায়া দেবীকে দিতেই চৈতালী বেশ রুক্ষভাবেই বলে, দিদি, যাকে এক কালে ঘেন্না করেছেন, অপমান করেছেন, তার কাছে বার বার আসবেন না। তাছাড়া আমি যথেষ্ট ব্যস্ত থাকি। যখন তখন এসে আমাকে বিরক্ত করবেন না।

আমি হাসতে হাসতে বলি, দেখছি, তুমি দ্বারকানাথ ঠাকুরের শিষ্যা!

যাই বলো বাচ্চু, এই মানুষগুলোকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

---যাইহোক তোমার প্রথম ছবির কথা বলো।

চৈতালী একটু হেসে বলে, সত্যি বলছি, প্রথম দিন স্টুডিও'র ফ্লোরে ঢুকে অত আলো, অত লোকজন, হৈ চৈ, ক্যামেরা, অমুদার গুরুগম্ভীর মুখ দেখে মনে হয়েছিল, আমি বোধহয় হার্টফেল করে মারা যাবো।

—তারপর কি করলে?

—অমুদা আমার কানে কানে বললেন, এখানে যা দেখছ, যাদের দেখছো, সব ভুলে যাও। তুমি চিত্ত মাস্টারের মেয়ে মালা। এ ছাড়া তোমার কোন পরিচয় নেই।

চৈতালী না থেমেই বলে, অমুদা কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখিয়ে বললেন, তাছাড়া তুমি তো তোমার বাবার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে! কোন মেয়ে কি বাবার সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলতে ভয় করে?

আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে ওর কথা শুনি।

ও একটু হেসে বলল, পর পর দু'বার মনিটর হবার পর অমুদা আবার

কাছে এসে ফিস ফিস করে বললেন, মালা, এবার ফাইন্যাল টেক হবে। আমি যেই বলব, স্টার্ট সাউন্ড, ক্যামেরা রোলিং, ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে তুমি মা কালীর নাম করে আস্তে আস্তে বাবার কাছে এগিয়ে যাবে।

চৈতালী হঠাৎ আমার একটা হাত ধরেই কাঁদতে কাঁদতে বলল, বিশ্বাস করো বাচ্চু, অমুদার চিৎকার শোনার পর আমি মুহূর্তের জন্য চোখ বন্ধ করে মা কালীকে মনে করেই চোখ খুলে দেখি, মা কালী ক্যামেরার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে কাছে ডাকছেন।

চৈতালী থামে না। থামতে পারে না।

—শুধু তাই না। আমি কানুদাকে দেখতে পেলাম না। দেখলাম, আমার বড় জ্যাঠা শুয়ে আছেন।

কথাগুলো বলতে বলতে ওর চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল গড়িয়ে পড়ে। তারপর বলে, সেদিন শুটিং'এর পর সবাই আমাকে অভিনন্দন জানালেন। সেই দিনই আমি মনে মনে স্থির বুঝে গেলাম, স্বয়ং মা কালী যখন আমার সহায়, তখন আমার জয় অনিবার্য।

—'একটু ভালবাসা' হিট করেছিল?

—তখন হিট-টিট বুঝতাম না ; তবে হরিবাবু প্রচুর লাভ না করলে নিশ্চয়ই আমাকে পাঁচ হাজার টাকা প্রাইজ দিতেন না।

—তা তো বটেই।

মুহূর্তের জন্য না থেমেই প্রশ্ন করলাম, হরিবাবুর পর পর পাঁচটা ছবিতেই তুমি হিরোইন হলে?

—হ্যাঁ।

ও একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়েই বলে, ঐ পাঁচটা ছবি করতে করতেই আমার জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে গেল।

—অনেক ঘটনা মানে?

চৈতালী খুব আস্তে আস্তে বলে, প্রথম দুটো ছবি করার সময় উদয় প্রত্যেক দিন আমার সঙ্গে স্টুডিও যেতো-আসতো। প্রথম ছবির জন্য একবার আর দ্বিতীয় ছবির জন্য তিনবার তিন জায়গায় আউটডোর হয়েছে। প্রত্যেকবারই উদয় আমার সঙ্গে গিয়েছে।

—থার্ড ছবিতেও আউটডোর ছিল?

—হ্যাঁ কিন্তু রওনা হবার দিন হঠাৎ উদয় বলল, এবার তুমি একাই যাও। পুরী আর কলকাতায় আমার কাজ আছে।

—উদয়ের বদলে কে তোমার সঙ্গে গেলেন?

—কেউ না।

—কেউ না?

আমি অবাক হয়ে বলি, মেয়ে আর্টিস্টদের সঙ্গে তো সব সময় একজন এসকর্ট যায়।

—যায় কিন্তু উদয় ছাড়া কে আমার সঙ্গে যাবে?

ও একটু থেমে বলে, প্রথমে আমি অনেক অনুনয় বিনয় করে সঙ্গে যেতে বললাম। তারপর বললাম, আমার বয়স বেশি না। আমি এই লাইনে নতুন। কে কেমন লোক, তা আমি জানি না। আমাকে এভাবে একলা ছেড়ে দেওয়া কি ভাল হবে?

—ও কি বলল?

—ওর ঐ এক কথা আমার কাজ আছে।

—আর কিছু বলল না?

—বলল, তুমি ঠিক নিজেকে সামলে রাখতে পারবে।

—আচ্ছা লোক তো!

চৈতালী দু'চার মিনিট কথা বলে না। হঠাৎ ওর দিকে তাকিয়ে দেখি, দুটো চোখ যেন আগুনের গোলার মত জ্বলছে। তারপর একবার খুব জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ও কেন যায়নি জানো?

—কেন?

—হরিবাবু আমাকে নিয়ে স্ফূর্তি করবেন বলে ওকে টাকা দিয়ে পুরী পাঠিয়ে দেন।

—তোমাকে কে বলল? তুমি কি করে জানলে?

—স্বয়ং হরিবাবু আমাকে বলেছিলেন।

—হরিবাবু নিজে?

—জী হ্যাঁ!

ছবির নাম 'এপার ওপার'। নায়ক স্বয়ং চঞ্চলকুমার, নায়িকা চৈতালী রায়। এই জুটির প্রথম ছবি। জয়পুর, যোধপুর আর জৈসালমেঢ়ে শুটিং হবে এক টানা আঠারো দিন। ঐ আঠারো দিনের মধ্যে তিনটে ডুয়েট গানের সিকোয়েন্স তোলা হবে। শুটিং হবে ট্রেনে, হোটেলে, পথেঘাটে, বালির পাহাড়ে। এক কথায় এলাহি ব্যাপার।

প্রোডাকশন ম্যানেজার সামন্তবাবু আগেই দু'বার গিয়েছেন সব বিধিব্যবস্থা করতে। শুটিং শুরু হবার সাতদিন আগেই তিনি তিন-চারজন সহকারীকে নিয়ে ওখানে পৌঁছে গেছেন। তার দু'দিন পরই ডিরেক্টর ওখানে গেলেন ক্যামেরাম্যানকে নিয়ে। তার পরের দিনই ইউনিটের অন্য সবাই ওখানে গেলেন। চঞ্চলকুমার অন্য একটা ছবির আউটডোর করে বোম্বে থেকে সোজা জয়পুর যাবেন। সব শেষে নায়িকা আর উদয়বাবুকে নিয়ে হরিবাবু যাবেন কলকাতা থেকে।

রওনা হবার দিন ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় হরিবাবু গাড়ি নিয়ে হাজির। চৈতালীর সঙ্গে সঙ্গে উদয়শঙ্করও সুটকেশ নিয়ে উঠলেন ঐ গাড়িতে। রাজা বসন্ত রায় রোড থেকে গাড়ি ল্যান্সডাউন রোডে পড়তেই হরিবাবু বললেন, উদয়বাবু, পুরীতে ক'দিনের কাজ?

উদয়শঙ্কর গম্ভীর হয়ে বলেন, আমাদের পুরীর বাড়ি নিয়ে বেশ ঝামেলা লেগেছে। ঠিক জানি না, ক'দিন থাকতে হবে।

—পুরীর কাজ মিটলে জয়পুর আসতে পারবেন না?

—না, না, অসম্ভব। কলকাতার দুটো বাড়ি নিয়েও মামলা শুরু হয়েছে। পুরী থেকে আমাকে সোজা কলকাতা আসতে হবে।

চৈতালী কোন কথা বলে না। অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসে থাকে।

হাওড়ায় কালকা মেলে চড়িয়ে দেবার পর উদয়শঙ্কর চৈতালীকে বলেন, মন দিয়ে কাজ কোরো আর সাবধানে থেকো।

উনি হরিবাবুকে বলেন, প্লীজ আপনি ওকে একটু দেখবেন।

—কিছু চিন্তা নেই। আমি তো পাশের কম্পার্টমেন্টেই আছি।

চৈতালী দু'বার্থের কম্পার্টমেন্টে একলা একলা বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করে। কখন যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, তা বুঝতেই পারে না।

পাশের কম্পার্টমেন্ট থেকে হরিবাবু এসে বলেন, ম্যাডাম, একলা একলা ভয় করবে না তো?

—না, না, ভয় করবে কেন?

—আমি পাশেই আছি। তাছাড়া বেল বাজালেই অ্যাটেনডান্ট আসবে।

—হ্যাঁ, ঠিক আছে।

—তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ুন। এখন যত রেস্ট নেবেন, তত ভাল। আউটডোরে তো আপনাকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে।

চৈতালী হাতের মাসিক পত্রিকাটি দেখিয়ে বলে, এইগুলো একটু উল্টে-পাল্টে দেখেই খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়ব।

পরের দিন হরিবাবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় এসে খবর নিয়েছেন। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। চৈতালী সত্যি খুব খুশি।

রাত্রিবাসের জন্য দিল্লীব হোটেলে পৌঁছেই হরিবাবু চৈতালীকে বলেন, আপনি বাথরুম থেকে বেরিয়েই রুম সার্ভিসকে ফোন করবেন। ওরা সঙ্গে সঙ্গে আপনার ডিনার দিয়ে যাবে। রাত্রে আমি আর আপনাকে বিরক্ত করতে আসব না।

উনি একটু থেমে বলেন, আমি আমার ঘরে যাচ্ছি।

পরের দিন সকালে আমেদাবাদ এক্সপ্রেসেও হরিবাবু বার বার জিজ্ঞেস করেন, ম্যাডাম, কোল্ড ড্রিঙ্ক খাবেন? অথবা চা-কফি?

চৈতালী একটু হেসে বলে, না, না, এখন কিছু দরকার নেই।

বেলা এগারটায়-সাড়ে এগারটা থেকেই হরিবাবু মাঝে মাঝেই বলেন, হট কেসে লাঞ্চ আছে। যখনই বলবেন, তখনই...

—অত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? খিদে লাগলে আমি নিয়ে নেব।

পাঁচটা বাজতে না বাজতেই জয়পুর।

ডিরেক্টর অমিয়বাবু, ক্যামেরাম্যান চ্যাটার্জীবাবু, প্রোডাকশন ম্যানেজার সামন্তবাবু ও ইউনিটের আরো অনেকেই ওদের অভ্যর্থনা করেন।

ট্রেন থেকে নেমেই হরিবাবু জিজ্ঞেস করেন, চঞ্চলদা এসেছেন?

অমিয়বাবু বললেন, এয়ারপোর্টে চঞ্চলকে রিসিভ করে ওকে হোটেলে পৌঁছে দিয়েই তো আমরা স্টেশনে এলাম।

—অমুদা, কাল থেকেই কাজ শুরু করতে পারবেন তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ. কাল সকাল থেকেই কাজ শুরু হবে।

বাইরে এসে গাড়িতে ওঠার আগে হরিবাবু বললেন, অমুদা, দেখছি ওয়েদার তো খুবই ভাল।

অমিয়দা একটু হেসে বলেন, এখন ওয়েদার ভাল হবে বলেই তো ইনডোরের বদলে আউটডোরের কাজ সেরে নিচ্ছি

--খুব ভাল করেছেন।

অমিয়বাবু এবার চৈতালীকে জিজ্ঞেস করেন, উদয় এলো না কেন?

—পুরী আর কলকাতার দু'তিনটে বাড়ি নিয়ে হঠাৎ মামলা-মোকদ্দমা শুরু হওয়ায় লাস্ট মোমেন্টে আটকে পড়ল।

—ও:

স্টেশন থেকে হোটেল মার্নাসিং।

চৈতালীকে ঘরে পৌঁছে দিয়েই সামন্তবাবু বলেন, ম্যাডাম. ঘর পছন্দ হয়েছে তো?

চৈতালী একবার চারপাশে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়ে বলে, এত সুন্দর ঘরও পছন্দ হবে না?

সামন্তবাবু ডান দিকের জানলা দেখিয়ে বলেন, চঞ্চলদা ঐ সামনের উইং-এ ঠিক এইরকমই একটা ঘরে আছেন।

—অমুদা আর হরিবাবুর ঘর কোথায়?

—অমুদা আছেন চঞ্চলদার পাশের ঘরেই আর হরিবাবু আছেন আপনার উল্টো দিকের ঘরে।

—ও আচ্ছা।

সন্ধে ঘুরে যাবার পর পরই চৈতালীর ঘরে টেলিফোন বেজে ওঠে রিসিভার তুলেই বলে, হ্যালো।

—আমি চঞ্চল। কি করছো?

—কিচ্ছু করছি না।

—সান্ধ্যকালীন আড্ডা কি আমার ঘরে হবে নাকি তোমার ঘরে?

—আপনি যা বলবেন।

—তাহলে আমার ঘরেই চলে এসো। অমুদা আর হরিবাবু দু'জনেই এখানে আছেন।

—আমি তো আপনার ঘর চিনি না।

—ঠিক আছে, আমি আসছি।

চৈতালী অবাক হয়ে বলে, আপনি নিজে আসবেন?

চঞ্চলকুমার একটু হেসে বলেন, তুমি কি আমার কাছে এই সৌজন্যটুকুও আশা করো না?

—না, না, তা না.

—তুমি রেডি হও। আমি দশ মিনিট পর আসছি।

চৈতালী ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে শাড়ির ঝুল আর আঁচল ঠিক করেই খোঁপাটা ঠিক করে বেঁধে নেয়।

দরজায় নক্ করার আওয়াজ শুনেই চৈতালী সঙ্গে সঙ্গে দরজা খোলে।

চঞ্চলকুমার একটু হেসে বলেন, রেডি তো?

—হ্যাঁ. হ্যাঁ।

—দরজার চাবি কোথায়?

চৈতালী সেন্টার টেবিলের উপর থেকে চাবিটা আনতেই চঞ্চলকুমার হাত বাড়িয়ে বলেন, আমাকে দাও।

চঞ্চলকুমার দরজা বন্ধ করেই চাবিটা ওকে দিয়ে বলেন, হ্যান্ড ব্যাগে রেখে দাও।

চৈতালীকে পাশে নিয়ে হাটতে হাটতেই চঞ্চলকুমার বলেন, শুনলাম, হঠাৎ জরুরী কাজে আটকে পড়ায় উদয়বাবু আসতে পারলেন না কিন্তু অন্য কাউকে সঙ্গে আনলে না কেন?

—সে রকম কেউ নেই।

—কোন একজন বন্ধুকে তো আনতে পারতে!,

চঞ্চলকুমার মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলেন, তোমার কি ধারণা আমরা সবাই সাধু?

চৈতালী কি বলবে? চুপ করে থাকে।

চঞ্চলকুমার ওর ঘরে ঢোকার আগে একটু চাপা গলায় বলেন, আমি

আছি। কোন চিন্তা নেই। রাত্তিরে যদি কেউ বিরক্ত করে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করবে।

চৈতালী মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

—না, না, তোমাকে ফোন করতে হবে না। আমিই মাঝে মাঝে ফোন করে তোমার খবর নেব।

—হ্যাঁ, সেই ভাল।

হ্যাঁ ওরা দু'জনে ঘরে ঢুকতেই হরিবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আসুন, ম্যাডাম, আসুন।

চৈতালী এগিয়ে যেতেই উনি বলেন, আঠারো দিন তো চঞ্চলের পাশেই বসবেন। এখন আমার পাশে বসুন।

চঞ্চলকুমার বললেন, যাও চৈতালী, প্রডিউসারের পাশেই বসো।

তিনটে গেলাসে হুইস্কী ঢালতে ঢালতেই অমিয়বাবু চৈতালীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি কি নেবে?

—ফ্রেস লাইম অ্যান্ড সোডা।

চঞ্চলকুমার একটু হেসে বলেন, একটু হুইস্কী নাও না!

—না, না, আমি ওসব খাই না।

চৈতালী প্রায় এক নিঃশ্বাসেই বলে, এতদিন যখন খাইনি, তখন নতুন করে শুরু করতে চাই না।

—এতদিন খাওনি বলে আজকে খাবে না কেন?

চঞ্চলকুমার একটু হেসে বলেন, বিয়ের আগে তো কোন পুরুষের সঙ্গে রাত কাটাওনি কিন্তু তাই বলে কি উদয়বাবুর সঙ্গে এক বিছানায় শোওনি?

চৈতালী আর অমিয়বাবু হাসেন কিন্তু হরিবাবু বেশ উল্লসিত হয়ে বলেন, ঠিক বলেছেন। নিন, নিন, আজ শুরু করুন।

চঞ্চলকুমার হাসি চেপে বলেন, নায়ক-নায়িকার কথার মাঝখানে আপনি ডায়ালোগ ছাড়বেন না।

চৈতালী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, প্রথম তিনটে দিন বেশ ভালভাবেই কেটে গেল। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত শুটিং হয়। সন্ধের পর আড্ডা দিতে দিতেই আমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায়।

ও একটু থেমে বলে, তার পরদিন অম্বর প্যালেসে শুটিং চলার সময়ই প্রোডাকশন ম্যানেজার এসে অমুদাকে বললেন, পুলিশ বলল, নাইট শুটিং আজকেই করতে হবে। অন্যদিন ওদের অসুবিধে আছে।

—সারাদিন কাজ করার পর আবার তোমাকে নাইট শুটিং করতে...

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও বলল, না, না, আমার না ; শুধু চঞ্চলের কতকগুলো শট্ ছিল জয়পুরের নানা জায়গায়।

—ও!

—যাইহোক সেদিন লাঞ্চের পর আর শুটিং হলো না। সন্ধের পর পরই চঞ্চলকে নিয়ে পুরো ইউনিট চলে গেল শুটিং করতে। হোটেলে রইলাম শুধু আমি আর হরিবাবু।

দরজায় নক্ করার আওয়াজ শুনেই চৈতালী দরজা খোলে। হরিবাবুকে দেখেই বলে, ও আপনি!

—ম্যাডাম, একলা একলা তো ড্রিঙ্ক করতে ভাল লাগে না ; তাই আপনি যদি কাইন্ডলি আমার ঘরে আসেন, তাহলে...

সপ্তাহ খানেক ধরে হরিবাবুকে দেখে চৈতালীর কখনও খারাপ মনে হয়নি। তাই ও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বলে, আপনি আমার ঘরে বসেই ড্রিঙ্ক করুন। এখানে বসেই আমরা গল্পগুজব করবো।

—ঠিক আছে।

হরিবাবু একটা স্কচের বোতল নিয়ে চৈতালীর ঘরে আসেন। নিজের গেলাসে হুইস্কী ঢেলেই চৈতালীর জন্য অ্যাপল্ জুস ছাড়াও ফ্রায়েড প্রন আর রোস্ট চিকেনের অর্ডার দেন।

হরিবাবু ড্রিঙ্ক করেন। চৈতালী অ্যাপল্ জুসের গেলাসে চুমুক দেয়। মাঝে মধ্যে প্রন বা চিকেনের টুকরো খেতে খেতেই দু'জনে পাশাপাশি বসেই গল্পগুজব করেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে চার পেগ পেটে পড়ার পরই হরিবাবু ডান হাত দিয়ে চৈতালীকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বেশ জড়িয়ে বলেন, যাই বলুন, উদয় খুব বুদ্ধিমান ছেলে।

চৈতালী ওঁর কথা বলার ধরন দেখেই বুঝতে পারে, ওঁর বেশ নেশা হয়েছে।

—লা-আ-ভ-লি ইয়ং ম্যান!

হরিবাবু আবার ঢক ঢক করে আধ গেলাস গলায় ঢেলেই বলেন, তোমাকে প্রথম দিন দেখেই আমার জিভে জল এসে গিয়েছিল।

চৈতালী বিরক্ত হয়ে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারে না ; বরং উল্টে হরিবাবু দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরেন।

চৈতালী বেশ রাগ করেই বলে, আঃ! ছেড়ে দিন।

—দেখো খুকী, যে লাইনে এসেছ, সেখানে এসব ন্যাকামী করে কোন লাভ নেই।

হরিবাবু ওর মুখের উপর মুখ রেখে বলেন, সব ছুঁড়িই জানে ছোট-খাটো রোল পেতে হলেও প্রডিউসারের সঙ্গে শুতে হয়। আর তোমাকে তো আমি এক লাফে হিরোইন করেছি।

চৈতালী কাঁদতে কাঁদতে বলে, প্লীজ, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন। আপনি বড্ড বেশি ড্রিঙ্ক করেছেন বলে অনেক আজেবাজে কথা বলছেন।

হরিবাবু একটু হেসে বলেন, আমরা জাতে মাতাল হলেও তালে ঠিক থাকি। আজ তোমাকে আমার চাই, চাই, চাই।

চৈতালী ঠাস করে ওর গালে চড় মেরেই বলে, অসভ্য জানোয়ার! কাকে কি বলছেন...

এক মুহূর্তে হরিবাবুর নেশা ছুটে যায়। পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ওর সামনে ধরে গম্ভীর হয়ে বলেন, ওহে খুকুরানী পড়ে দেখো।

হঠাৎ চৈতালী থামে। মুখ নীচু করে বসে থাকে। কোন কথা বলে না।

পাঁচ-সাত মিনিট পর আমি জিজ্ঞেস করলাম, ঐ কাগজে কি লেখা ছিল।

ও মুখ উঁচু করে আস্তে আস্তে বলে, দেখলাম, উদয়ের সই করা একটা রসিদ আর ছোট্ট একটা চিঠি।

—কোন টাকা নেবার রসিদ?

—হ্যাঁ।

ও একটু ম্লান হাসি হেসে বলল, আমার সঙ্গে রাজস্থান আসা-যাওয়া খাওয়া-দাওয়া ও অন্যান্য খরচ বাবদ আট হাজার টাকা নিয়েছে।

—ও মাই গড!

আমি না থেমেই বলি, উনি এলেন না অথচ...

—তাহলেই বুঝে দেখো, ও ইচ্ছে করেই আমাকে হরিবাবুর খপ্পরে ছেড়ে দিয়েছিল

—আর ঐ চিঠিতে কি লেখা ছিল?

—উদয় লিখেছিল, আপনার পরামর্শ মত আমি রাজস্থানের বদলে পুরীই যাবো। আপনারা যেদিন ফিরবেন, আমিও সেইদিনই ভোরে ফিরে স্টেশনে আপনাদেব রিসিভ করবো। আর হ্যাঁ, চৈতালীর সব দায়িত্ব আপনার। ও নিশ্চয়ই আপনার অবাধ্য হবে না।

—কি আশ্চর্য!

ও একটু হেসে বলেন, বাচ্চু, এই মহাপুরুষই আমার স্বামী ছিলেন আর ওরই জন্য সে রাত্রে হরিবাবু আমার সর্বনাশ করলেন।

চৈতালী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, স্বামী ছাড়া হরিবাবুই প্রথম আমার মধু খেয়েছিলেন।

আমি সঙ্গে সঙ্গেই বলি, তুমি এর পরেও ওর ছবিতে কাজ করেছিলে?

—বাধ্য হয়ে করেছিলাম।

—বাধ্য হয়ে কেন?

—আমি বলেছিলাম, আর ওর ছবিতে কাজ করবো না। হরিবাবু সঙ্গে সঙ্গে কনট্রাক্টের কপি দেখিয়ে বললেন, এক সপ্তাহের মধ্যে তিনটে ছবি না করার জন্য ছ'লাখ টাকা দিয়ে কাজ বন্ধ করে দিন।

—এক একটা ছবি না করার জন্য দু'লাখ করে...

—হ্যাঁ।

—তুমি সই করার আগে কনট্রাক্ট পড়ে দেখো নি?

—উদয় একবার চোখ বুলিয়েই নিজে সই করে আমাকে সই কবতে বলেছিল। আমি জয়পুরে গিয়ে সব কিছু জানলাম।

একটু চুপ করে থাকার পর বলি, রাজস্থানে শুটিং করার সময় হরিবাবু আর কোনদিন তোমাকে বিরক্ত করেছিলেন?

চৈতালী প্রথমে মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, তারপর মুখে বলে, শুধু সেবার রাজস্থানেই না, পরের দুটো ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত হরিবাবুকে মাঝে মাঝেই আমার খুশি করতে হয়েছে।

—তুমি উদয়কে সব কথা বলেছিলে?

—না।

—কেন বলোনি?

—ওকে বলে হবে কি? সামান্য কিছু টাকার লোভে ও নিজেই তো হরিবাবুর গোলাম হয়ে গিয়েছিল।

—তোমার পরিচালক অমিয় সেন কি রকম মানুষ ছিলেন?

—হরিবাবুর কোম্পানীর শেষ ছবিটা করার সময় অমুদা একদিন আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়েছিলেন।

এবার একটু হেসে বলি, আর বাঙ্গালীর প্রিয়তম নায়ক চঞ্চলকুমার?

—তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না, আমি ওর সঙ্গে বোধহয় তিরিশ-বত্রিশটা ছবিতে অভিনয় করেছি...

আমি ওর কথার মাঝখানেই মন্তব্য করি. সবই দারুণ রোমান্টিক ছবি!

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, আউটডোরে গিয়ে ওর সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেছি, কত হাসি-ঠাট্টা করেছি কিন্তু শুটিং'এর সময় ছাড়া ও কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও আমার হাত পর্যন্ত ধরেনি।

—বলো কি?

চৈতালী একটু হেসে বলে, আমি জানি, ফিল্ম লাইনের বাইরের লক্ষ লক্ষ

মানুষের ধারণা, আমরা প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি, স্বামী-স্ত্রীর মত জীবন কাটাই কিন্তু ও নিছকই আমার বন্ধু।

ও একটু থেমে বলে, ফিল্ম লাইনের কোন মেয়ের সঙ্গেই ওর কোন সম্পর্ক আছে বলে আমি জানিও না, বিশ্বাসও করি না।

কিছুক্ষণ আমরা কেউই কোন কথা বলি না। তারপর আমি প্রশ্ন করি, ঐ পাঁচটা ছবি করার পরই নিশ্চয় তুমি বিখ্যাত হলে?

—শুধু বিখ্যাত কেন, আরো অনেক কিছুই হলাম।

—অনেক কিছু মানে?

—স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে শিখলাম ; টাকার লোভে স্বামী কত নীচ, কত স্বার্থপর হতে পারে, তা জানলাম ; পুরুষ মানুষেরা যে মেয়েদের সর্বনাশ করে আনন্দ পায়, তা দেখলাম।...

—আর কি দেখলে জানলে?

—সব স্বামীকে নিয়ে যে মেয়েরা ঘর করতে পারে না, তা খুব ভাল করে বুঝলাম।

—ঐ সময়ই তো তোমাদের ডিভোর্স হয়?

—হ্যাঁ।

—ডিভোর্স করলে কেন?

—যে স্বামী নির্বিবাদে স্ত্রীকে নেকড়ে বাঘের ঘরে ছেড়ে দিতে পারে তাকে নিয়ে ঘর করা যায়?

চৈতালী প্রায় না থেমেই বলে, যে স্বামী আমারই টাকায় মদ খায়, অন্য মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করে আমারই চরম সর্বনাশ করে, তাকে নিয়ে ঘর করার মত মেয়ে আমি না।

আমি চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি। ও আপনমনে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যায়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলে, আচ্ছা বাচ্চু, কিছু না হারিয়ে কি এই পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না?

ছয়

এ সংসারে সব মানুষেরই কিছু গোপন কথা থাকে। কিশোর-কিশোরী থেকে বুড়ো-বুড়ীদের পর্যন্ত স্মৃতির ভাণ্ডারে কিছু না কিছু গোপন কাহিনী লুকিয়ে থাকে। থাকবেই।

আবার এ কথাও ঠিক জীবনের কোন না কোন সময়ে সবাই সে গোপন কাহিনী কখনও স্বেচ্ছায়, কখনও পরিস্থিতির চাপে প্রকাশ করবেনই। কোন গোপন কাহিনী বা রহস্য অনন্তকাল চাপা থাকে না।

তাছাড়া আরো একটা ব্যাপার আছে। যাঁদের জীবন ঘটনাবহুল ও বহু গোপন কথা মনের মধ্যে লুকিয়ে রাখেন, তাঁরা জীবনের কোন বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ কোন প্রিয়জন বা বিশ্বস্ত বন্ধুকে সবকিছু প্রকাশ করে এক বিচিত্র শান্তিলাভ করেন। চৈতালীর হয়েছে তাই। সে সব কিছু প্রকাশ না করে স্বস্তি পাচ্ছে না।

পরের দিন ব্রেকফাস্ট খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করলাম, উদয়কে ডিভোর্স করার সিদ্ধান্ত কি হরিবাবুর শেষ ছবি করার সময় নিয়েছিলে?

চৈতালী ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছে বলল, ওকে নিয়ে যে ঘর করতে পারবো না, তা অনেক আগেই বুঝেছিলাম।

ও একটু থেমে বলে, হরিবাবুর দ্বিতীয় ছবিটা করার সময় থেকেই ও আমার সঙ্গে বড্ড দুর্ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। যত দিন যাচ্ছিল, ও তত বেশি খারাপ ব্যবহার করছিল। তারপর 'এপার ওপার' ছবির আউটডোর থেকে ফিরে আসার দু'চারদিন পরই একটা ঘটনা ঘটল।.....

চৈতালী ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলে, উদয়, আমার ক্রীম আর ফেস পাউডার ফুরিয়ে গেছে। কাল মনে করে কিনে এনো।

উদয় চুপ করে শুয়ে থাকে। কোন কথা বলে না।

চৈতালী বলে, আমি কি বললাম, তা শুনেছ?

না, এবারও উদয় কোন জবাব দেয় না।

চৈতালী অবাক হয়ে ওর কাছে এগিয়ে যায়। ওর মুখের সামনে মুখ নিয়ে

একটু হেসে বলে, কি হলো? আমার কথার জবাব দিচ্ছো না যে?

উদয় অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ওকে একটু ধাক্কা দেয় কিন্তু কোন কথা বলে না।

—এত মেজাজ দেখাচ্ছো কেন? কি হয়েছে তোমার?

ও একটু থেমে বলে, একটা ক্রীম আর ফেস পাউডার আনতে বলে আমি কি এমন অপরাধ করলাম যে তোমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল?

—আর ক্রীম মাখতে হবে না।

—কেন?

—ক্রীম না মাখলেও অনেক মৌমাছি তোমার চারপাশে ভন ভন করবে।

চৈতাল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলে, তার মানে?

—ন্যাকামী করো না। যা বলছি খুবই বুঝতে পারছো।

—আমার চারপাশে মৌমাছি ভন ভন করে না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আর যদি করে, তার জন্য আমি দায়ী না, তুমি দায়ী।

উদয় এক লাফ দিয়ে নেমে এসেই ওর গালে ঠাস করে এক চড় মেরে বলে, হারামজাদী, আমি দায়ী?

চৈতালী সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, সেই দিনই আমি বুঝতে পারি, উদয়কে নিয়ে ঘর করা সম্ভব হবে না।

আমি বলি, ঐ ঘটনার পর তুমি তোমার বাবার কাছে চলে গেলে না কেন?

—প্রথমত, বাবা তখন বেশ অসুস্থ। তাছাড়া একটা বিবাহিতা মেয়ে কত কাল বাপের বাড়িতে থাকতে পারে?

—তা ঠিক।

—যাইহোক তবু কোনমতে নিজেকে সংযত করে ওখানে থেকে গেলাম।

ও হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, বাচ্চু, তুমি ভাবতে পারবে না, শেষ দুটো বছর কিভাবে ও বাড়িতে কাটিয়েছি। স্বামী, শাশুড়ী তো দূরের কথা, ঠাকুর চাকররাও আমার সঙ্গে কথা বলতো না। শুধু আরতি বলে একটা মেয়ে

আমাকে খেতে দেবার সময় দু' একটা কথা বলতো।

—তোমার অপরাধ?

—আমি সিনেমায় নেমে ঐ ফ্যামিলীর মান-সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছি।

—তুমি তো নিজে ইচ্ছে করে সিনেমায় নামোনি?

চৈতালী একটু হেসে বলে, সেকথা একদিন বলেছিলাম বলে শাশুড়ী দয়া করে চাকর বাকরের সামনেই আমার গালে দু'চারটে চড়-থাপ্পড় মেরেছিলেন।

—বলো কি?

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দ্যাখো বাচ্চু, তুমি নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী ঘরের মেয়েরা যেমন ভীতু, সেইরকমই কনজারভেটিড হয়। তাদের সহ্যের সীমাও অসীম। ভয়ঙ্কর কিছু না ঘটলে এইসব মেয়েরা আত্মহত্যা বা বিদ্রোহ করতে পারে না।

একটু চুপ করে থাকার পর জিজ্ঞেস করি, ডিভোর্সের মামলা চলার সময় কি শ্বশুরবাড়িতেই ছিলে?

—না।

ও একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে, প্রথম মাস তিনেক সুনন্দাদিব বাড়ি ছিলাম। তারপর ঘুরে-ফিরে আরো চার-পাঁচজন বন্ধুবান্ধবের কাছে থেকেছি।

একটু হেসে বলি, পুরুষ বন্ধুদেব বাড়ি?

—হ্যাঁ, একজন পুরুষ বন্ধুর বাড়িতেও কিছুদিন ছিলাম।

—ফিল্ম লাইনের বাইরের বন্ধু তো?

আমার প্রশ্ন শুনে চৈতালী হেসে ওঠে। তারপর বলে, ব্যস্ত হচ্ছো কেন?

—শেষ পর্যন্ত কবে ডিভোর্স পেলে?

—হরিবাবুর শেষ ছবি শেষ হবার ঠিক তিন মাস পরে।

—ডিভোর্স হবার পর কোথায় থাকতে?

—কোর্ট থেকে সোজা চলে এলাম আলিপুরের বাড়িতে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলি, মিঃ চাকলাদারের বাড়িতে?

ও কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বলল, হ্যাঁ।

—চাকলাদারের মত একজন শিল্পপতির সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব হলো কিভাবে?

—'এপার ওপার' রিলিজ হবার দিন সাতেক পরের কথা। ইন্দ্রপুরীতে 'তোমাকে চাই' এর সুটিং চলছে। হঠাৎ অমুদা আমার মেক আপ রুমে এসে হাজির।....

পরিচালক অমিয় সেন এক গাল হেসে বললেন, চৈতি, তোমার জয় জয়কার।

চৈতালী অবাক হয়ে বলে, তার মানে?

—পি. এন. চাকলাদারের নাম শুনেছ?

ও ঘাড় নেড়ে বলে, না।

—সেকি? তুমি কি খবরের কাগজ পড়ো না?

ও একটু হেসে বলে, পড়ি কিন্তু শুধু সিনেমার খবর।

অমিয়বাবু চোখ দুটো বড় বড় করে বলেন, আমাদের দেশের একজন বিখ্যাত শিল্পপতি। কত বড় বড় কলকারাখানার যে মালিক, তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না।

উনি একটু থেমে বলেন, নেহরু—বিধান রায় পর্যন্ত প্রায়ই ওঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন।

এতক্ষণ পরে চৈতালী বলে, তার মানে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই খুব গুণী!

এবার অমিয়বাবু একটু হেসে বলেন, অমন বিখ্যাত কোটিপতি হয়েও উনি নাটক-গানবাজনার ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহী। 'এপার ওপারে' তোমার অভিনয় দেখে উনি খুব খুশি হয়েছেন।

—সত্যি?

—বাইরে এসো। তাহলেই সব জানতে পারবে।

চৈতালী পরিচালকের পিছন পিছন বাইরে এসে দেখে, বিরাট একটা ক্যাডিলাক গাড়ির সামনে একজন সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে।

অমিয়বাবু বললেন, চৈতি, ইনি গৌতম রায়চৌধুরী ; মিঃ চাকলাদারের পার্সোন্যাল সেক্রেটারী।

গৌতমবাবু দু'হাত জোড় করে নমস্কার করেই বিশাল ফুলের তোড়াটা চৈতালীর হাতে তুলে দিয়ে বলেন, 'এপার ওপার' ছবিতে আপনার অভিনয় মিঃ চাকলাদের খুব ভাল লেগেছে বলেই এই বোকে পাঠিয়েছেন।

উর্দিপরা ড্রাইভার একটা বেশ বড় প্যাকেট এনে গৌতমবাবুর হাতে দিতেই উনি সেটাও চৈতালীর হাতে দিয়ে বলেন, আপনি ও আপনার সহকর্মীদের জন্য মিঃ চাকলাদার সামান্য একটু মিষ্টি পাঠিয়েছেন।

প্যাকেটটা সঙ্গে সঙ্গে অমিয়বাবুর হাতে দিয়ে চৈতালী বলে, অমুদা, প্লীজ সবাইকে দিয়ে দিন।

অমিয়বাবু মিষ্টির প্যাকেট নিয়ে ফ্লোরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই গৌতমবাবু একটা খাম চৈতালীর হাতে দিয়ে একটু হেসে বলেন, এর মধ্যে একটা কার্ড আছে।

চৈতালী অভিভূত হয়ে বলে, ওর মত বিখ্যাত মানুষ যে আমার অভিনয় দেখে খুশি হয়েছেন, সে আমার পরম সৌভাগ্য।

—-যদি পারেন মিঃ চাকলাদারকে একটা ফোন করবেন।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করবো কিন্তু ওঁর টেলিফোন নম্বর...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই গৌতমবাবু বলেন, ঐ কার্ডেই পেয়ে যাবেন।

—-ঠিক আছে।

চৈতালী মেক আপ রুমে এসেই খাম খুলে দেখে মিঃ চাকলাদারের সই করা একটা সুন্দর কার্ড। সঙ্গে ছোট্ট একটা চিরকুট : চৈতালী, যে কোনদিন যে কোন প্রয়োজনে আমাকে ফোন করলে খুব খুশি হবো।—পি. এন. সি।

ব্যস!

মিঃ চাকলাদারের এই আন্তরিকতায় চৈতালী মুগ্ধ হয়ে যায়। একবার মনে করে ছুটে গিয়ে ফোন করে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানায় কিন্তু দ্বিধা দ্বন্দ ভয়ে পিছিয়ে যায়। অত বিখ্যাত মানুষের সঙ্গে যদি ঠিক মত কথা বলতে না পারে?

একটু পরেই অমিয়বাবু মেক আপ রুমে এসে হাসতে হাসতে বলেন. চাকলাদার সাহেবের ব্যাপারই আলাদা। প্যাকেট খুলে দেখি, ভীম নাগের

সন্দেশ। আমরা তো টপাটপ খেতে শুরু করলাম। হঠাৎ একজন লাইটম্যান আমাকে বলল, স্যার, দেখেছেন, সন্দেশের উপর কি লেখা?

অমিয়বাবু একটা সন্দেশ চৈতালীর সামনে ধরে বলেন, দ্যাখো, দ্যাখো, লেখা আছে, চৈতালীকে অভিনন্দন!

চৈতালী স্তম্ভিত হয়ে যায়।

অমিয়বাবু বলেন, চাকলাদার সাহেবের যেমন পয়সা আছে, সেই রকমই রুচি আছে, মন আছে। গুণীর কদর করতে জানেন।

চৈতালী মুখে কিছু না বললেও মনে মনে চাকলাদার সাহেবকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানায়।

এই ভাবে কয়েক মাস কেটে যায়। পূজার ঠিক আগে 'তোমাকে চাই' রিলিজ করলো রূপবাণী-অরুণা-ইন্দিরায়। পরের দিনই কলকাতার সব কাগজে বেরুল 'তোমাকে চাই' এর টিকিটের জন্য হাহাকার। পূজার ক'দিন তো দূরের কথা, মাসখানেক পরেও তিনটি হলেরই প্রত্যেকটি শো হাউস ফুল। পশ্চিম বঙ্গের অন্যান্য বারো-তেরটি হলের অবস্থাও তথৈ ব চ। চৈতালী রায় তো দূরের কথা, প্রডিউসার বা ডিরেক্টরও ভাবতে পারেন নি ছবিটি সুপার হিট হবে।

হঠাৎ একদিন সকালে হরিবাবু আর অমিয়বাবু চৈতালীদের রাজা বসন্ত রায় রোডের বাড়িতে এসে হাজির।

চৈতালী অবাক হয়ে বলে, কি ব্যাপার? হঠাৎ আপনারা?

হরিবাবু দন্ত বিকশিত করে বলেন, দারুণ খবর আছে।

অমিয়বাবু বললেন, হ্যাঁ, সত্যি দারুণ খবর আছে।

উনি একটু থেমে বলেন, রেড ক্রশ সোসাইটি থেকে হরিদাকে অনুরোধ করেছে, সামনের রবিবার ইন্দিরায় ইভনিং শো রেড ক্রশের জন্য চ্যারিটি শো করতে। টিকিট বিক্রীর টাকা হরিদা তুলে দেবেন চীফ মিনিস্টার বিধান রায়ের হাতে ; তারপর ডাঃ রায় ঐ টাকা দেবেন রেড ক্রশের প্রেসিডেন্টকে।

চৈতালী শুধু একটু হাসে।

—তোমাকে ঐ শো' তে উপস্থিত থাকতে হবে।

—শুধু আমি?

—হ্যাঁ ; চঞ্চল তো একটা ছবির আউট ডোর করতে গতকালই নেতারহাট গিয়েছে। দিন দশ-বারোর আগে ও ফিরবে না।

—উদয় যদি আপত্তি না করে তাহলে নিশ্চয়ই যাবো।

হরিবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলেন, উদয় কাল সন্ধেবেলায় আমার অফিসে এসেছিল। তখনই ওকে রেডক্রশের সেক্রেটারীর চিঠিটা দেখাই।

চৈতালী জিজ্ঞেস করে, ও কি বলল?

—ও বলল, যে শো' তে চীফ মিনিস্টার আসছেন, সেখানে চৈতালী যাবে না, তাই কখনো হতে পারে?

—তাহলে নিশ্চয়ই যাবো।

বিদায় নেবার আগে অমিয়বাবু বললেন, আমি ঠিক পাঁচটায় আসবো। তুমি রেডি হয়ে থেকো। চীফ মিনিস্টার পৌঁছবেন পাঁচটা পঁচিশে। তোমাকে নিয়ে তার আগে পৌঁছতেই হবে।

হবিবাবু এক গাল হেসে বললেন, ঐ ফাংশানে কি আপনি দু'এক মিনিট বক্তৃতা দেবেন?

—না, বাবা, ওসব আমি পারবো না।

চৈতালী হাসতে হাসতেই বলে।

রবিবার সাত সকালেই শ্বশুরমশাই চৈতালীকে ডেকে পাঠালেন।

চৈতালী ঘরে ঢুকতেই উনি একটু হেসে বললেন, আজ তোমার ছবি দেখতে বিধানবাবু আসবেন বলে সব কাগজে খুব বড় বড় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ বৌমা!

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন, সত্যি খুবই সম্মানের ব্যাপার। বিধানবাবুর সঙ্গে তোমার কি কথা হয়, তা আমাকে জানিও।

—হ্যাঁ, বাবা, নিশ্চয়ই বলব।

পাঁচটা না, পৌনে পাঁচটাতেই অমিয়বাবু গাড়ি নিয়ে হাজির। চৈতালীও প্রায় তৈরি ছিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ও রওনা হয়।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই অমিয়বাবু একটু হেসে বললেন, হলের চতুর্দিকে কি ভীড় হয়েছে, তা তুমি ভাবতে পারবে না।

চৈতালী শুধু একটু হাসে।

—তোমাকে দেখার জন্য লোকজন পাগল!

উনি একটু থেমেই বলেন, ডাঃ রায় আসছেন বলে প্রচুর পুলিশ আছে। তোমার কোন চিন্তা নেই।

হলের কাছাকাছি আসতে ভীড় দেখে চৈতালী অবাক হয়ে যায়। একটু ঘাবড়েও যায়। বলে, অমুদা, ওরা আমাকে ধরে টানাটানি করবে না তো?

—না, না, কিচ্ছু হবে না। দেখছ না পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে আছে।

গাড়িটা হলের সামনে এসে থামার ঠিক আগেই অমিয়বাবু বললেন, চৈতি, গাড়ি থেকে নেমেই হাত জোড় করে চারদিকের লোকজনকে নমস্কার করার পরই ভিতরে ঢুকবে।

গাড়ি থামতেই একজন ডেপুটি কমিশনার নিজে গাড়ির দরজা খুলে বললেন, আসুন, ম্যাডাম।

চৈতালী গাড়ি থেকে নামতেই হাজার হাজার নারী-পুরুষ হৈ হৈ করে উঠল। চৈতালী হাত জোড় করে চারদিকের মানুষকে নমস্কার করতেই খুশিতে ফেটে পড়ে জনতা।

না, আর এক মুহূর্ত ও দাঁড়ায় না। দু'তিনজন পুলিশ অফিসার, ইন্দিরার ম্যানেজার আর পরিচালকের সঙ্গে ও ভিতরে চলে যায়।

দু'তিন মিনিটে'র মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় এলেন। সঙ্গে অত্যন্ত সুদর্শন এক সুপুরুষ। উইংস' এর পাশ থেকে চৈতালী দেখে। মঞ্চে চারটি চেয়ার। একেবারে ডান দিকে প্রযোজক, তারপর ডাঃ রায়, তার পাশে ঐ সুদর্শন ভদ্রলোক; একেবারে বাঁ দিকের চেয়ারটা খালি। ওরা তিনজন আসন গ্রহণ করতেই মঞ্চের পর্দা উঠল। চৈতালী মুখ্যমন্ত্রীর হাতে ফুলের স্তবক দিতেই হলের সমস্ত দর্শক হাততালি দিলো। বাঁ দিকের খালি চেয়ারে বসলো চৈতালী। প্রতি মুহূর্তে জ্বলে উঠল অজস্র ফ্ল্যাশ বালব্।

ডাঃ রায় মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, সিনেমা-থিয়েটার দেখার ইচ্ছেও হয় না, সময়ও পাই না। তবে আমি নিজে ডাক্তার। তাই রেড ক্রশের

ব্যাপারে সব সময়ই উৎসাহী। তাছাড়া এখন তো রেড ক্রশের প্রেসিডেন্ট আমাদের অত্যন্ত স্নেহের পি. এন. চাকলাদার। তাঁর কথা তো ফেলতে পারি না। তাই এসেছি।.....

স্বয়ং মিঃ চাকলাদার তার পাশে বসে আছেন বুঝতে পেরেই চৈতালী যেন চমকে উঠে।

ডাঃ রায় বলেন, আমি বাড়ি থেকে রওনা হবার একটু আগেই পুলিশ কমিশনার এসেছিলেন একটা জরুরী ব্যাপারে। তারপর উনি বললেন, টিকিটের দাম ডবল হলেও হল ভর্তি হয়ে গেছে। আপনারা বেশি দাম দিয়ে টিকিট কিনে খুব ভাল কাজ করেছেন। চাকলাদার নিজের পকেট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা রেড ক্রশকে দেন কিন্তু সাধারণ মানুষেরও তো কিছু দায়িত্ব আছে....

মিঃ চাকলাদার বললেন, আমরা দেখেছি, চ্যারিটি শো করেই সব চাইতে বেশি টাকা তোলা যায়। 'তোমাকে চাই' হিট করেছে জানতে পেরেই আমি আজকের চ্যারিটি শো'র উদ্যোগ নিই। আজকের এই অনুষ্ঠানে চঞ্চল থাকলে খুবই ভাল হতো কিন্তু ও এখানে নেই। তবে আমাদের সৌভাগ্য বাংলা সিনেমার সর্বজনপ্রিয়া নায়িকা চৈতালী রায় এসেছেন। আমি নিজেও আপনাদের মত চৈতালীর ফ্যান।....

এর পর হরিবাবু চ্যারিটি শো'র সংগৃহীত অর্থের চেক দিলেন ডাঃ রায়কে ও ডাঃ রায় সে চেকটি দিলেন মিঃ চাকলাদারের হাতে।

চৈতালী স্বপ্নেও ভাবেনি, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের মত ব্যস্ত মানুষ পুরো ছবিটা দেখবেন। শুধু কি তাই? ওর এক পাশে বসলেন ডাঃ রায়, অন্য দিকে মিঃ চাকলাদার। কত প্রেস ফটোগ্রাফার যে ওদের তিনজনের ঐ ছবি তুললেন, তার ঠিকঠিকানা নেই। ওদের ছবি তোলা শেষ হতেই শুরু হলো ছবি।

চৈতালীর বাঁ দিকের হাতলে ডাঃ রায়ের হাত ; তাই ও ডান দিকের হাতলে হাত রাখে। দশ-পনের মিনিট পর হঠাৎ ওর হাতের উপর হাত রাখলেন মিঃ চাকলাদার। চৈতালী হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করতেই উনি আলতো করে চেপে ধরেন। অত বিখ্যাত মানুষের হাতের ছোঁয়ায় ও একটু

রোমাঞ্চিত না হয়ে পারে না। গর্বও অনুভব করে।

ছবি শেষ হয়। রিপোর্টাররা ঘিরে ধরেন মুখ্যমন্ত্রীকে।

—কত দিন পর সিনেমা দেখলেন?

—বছর পাঁচেক আগেই তো সিনেমা দেখতে হয়েছিল।

মুখ্যমন্ত্রী একটু থেমেই বলেন, ঐ যে বোম্বের রাজকাপুর এসে ধরল এয়ার ফোর্সের ওয়ার উইডোদের জন্য চ্যারিটি শো'তে ওর ছবি দেখতে হবে, তাই যেতে হয়েছিল।

—'তোমাকে চাই' কেমন লাগলো?

—আমি কি সিনেমার অত-শত বুঝি?

ডাঃ রায় পাশ ফিরে চৈতালীকে বললেন, তুমি তো বেশ ভাল অভিনয় করো। কি করে যে তুমি এত ভাল অভিনয় করলে তা তো আমার মাথায় ঢোকে না।

পরের দিন স্টেটসম্যানের মত কাগজেও প্রথম পাতায় ডাঃ রায়ের সিনেমা দেখার ছবি। মাঝখানে চৈতালী রায়; তার বাঁ দিকে ডাঃ রায়, ডান দিকে মিঃ চাকলাদার। প্রথম পাতাতেই ছবি আর খবর ছাপা হলো অন্য সব দৈনিকে।

শ্বশুরমশাই চৈতালীকে বললেন, বৌমা, আজকের খবরের কাগজগুলো দেখে সত্যি তোমার জন্য গর্ব হচ্ছে। বিধানবাবুর মত মানুষ তোমার পাশে বসে তোমার ছবি দেখছেন, এ সত্যি ভাবা যায় না।

চৈতালী আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলল, তারপর থেকে টুকটাক যোগাযোগ দেখাশুনা হওয়া শুরু হলো। আস্তে আস্তে বুঝতে পারলাম, চাকলাদার আমার প্রেমে পড়েছেন।

—আর তুমি?

আমার প্রশ্ন শুনে ও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারে না। আপনমনে কি যেন চিন্তা করে। পর পর দুটো সিগারেট খায়। তারপর বেশ গম্ভীর হয়েই বলে, দ্যাখো বাচ্চু, অস্বীকার করবো না চাকলাদারকেও আমার খুব ভাল লেগেছিল। ঐ রূপ, ঐ খ্যাতি-ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও কত সহজ সরল হাসিখুশি

ও মিশুকে ছিলেন।

আমি একটু হেসে বলি, উর্বশী, তুমি কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব দাওনি।

—হ্যাঁ, তখন আমি নিশ্চয়ই ওর প্রেমে পড়েছিলাম।

—হ্যাঁ, এবার তুমি তোমার কথা বলে যাও।

চৈতালী একটু চুপ করে থাকার পর বলে, তুমি আমার তখনকার মানসিক অবস্থা কল্পনাও করতে পারবে না। একদিকে হু হু করে আমার জনপ্রিয়তা বাড়ছে, নতুন ছবিতে কনট্রাক্ট করাবার জন্য দলে দলে প্রডিউসাররা আসছেন ; অন্য দিকে হরিবাবু তার খেয়াল-খুশি মত আমাকে উপভোগ করছেন আর তারই সঙ্গে সমান তালে চলছে উদয়ের অত্যাচার।

ও একটু থেমে বলে, তখন সেই পরিস্থিতিতে মনে হয়েছিল, মিঃ চাকলাদার নিশ্চয়ই আমার বিপদের দিনে পাশে দাঁড়াবেন।

—বিপদের দিনে ওকে পাশে পেয়েছিলে?

—হ্যাঁ, পেয়েছিলাম।

চৈতালী একটু থেমে বলে, হরিবাবুর শেষ ছবিটার কাজ শুরু হবার পর পরই একদিন মিঃ চাকলাদারকে সব কথা খুলে বললাম।

মিঃ চাকলাদার দু'এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বললেন, তোমার সমস্যার কথাগুলো জানলাম কিন্তু তুমি কি চাও, তা তো বললে না।

—আমি চাই উদয়কে ডিভোর্স করতে।

—আর কি চাও?

—আর চাই অভিনয় করে খ্যাতি যশ আর প্রচুর টাকা আয় করতে।

—নতুন ছবির জন্য নতুন কোন চুক্তিতে সই করেছ?

—না।

চৈতালী একটু থেমে বলে, উদয় খুব চাপ দিচ্ছে দশ-বারোটা নতুন ছবির জন্য সই করে বেশ কিছু অ্যাডভ্যান্স নিতে কিন্তু আমি রাজি হইনি।

—ভাল করেছ।

মিঃ চাকলাদার একটু থেমে বলেন, হরিবাবুর এই ছবিটার কাজ আগে শেষ করো। তার আগে কারুর কাছ থেকে একটি পয়সাও নিও না।

চৈতালী মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

মিঃ চাকলাদার বলেন, যে ছবির গল্প তোমার পছন্দ হবে ও যে পার্টি তোমাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিতে রাজি, শুধু সেই ছবিগুলোর জন্যই তুমি চুক্তি করবে।

—এক লাফে পঁচিশ হাজার?

—দু' পাঁচ হাজার বেশি চাইলে প্রডিউসাররা মনে করবে, তুমি ঠিক অন্য অভিনেত্রীদের মতই।

উনি একটু থেমে বলেন, তুমি সুন্দরী, তুমি ভাল অভিনয় করো, তোমাকে পাবলিক ভালবাসে, সুতরাং যদি নিজের প্রেস্টিজ রাখতে চাও, তাহলে পঁচিশ হাজারের এক পয়সা কম নিয়ে তুমি ছবি করবে না।

চৈতালী মন দিয়ে ওর কথা শোনে।

—পাঁচ-দশ হাজার টাকায় দশটা ছবিতে অভিনয় করার চাইতে পঁচিশ হাজারের পাঁচটা ভালো ছবিতে কাজ করা অনেক ভাল।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

—ডিভোর্সের মামলার ব্যাপারে তোমার কোন চিন্তা নেই। তুমি শুধু দু' চারটে কাগজে সই করে দেবে ; তারপর সবকিছু উকিলরাই করবেন।

উনি এক নিঃশ্বাসেই বলেন, তোমাকে মাত্র একদিন কোর্টে যেতে হবে।

চৈতালী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমি টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে ছিলাম। গৌতম আর উকিলবাবু এসে খবর দিলেন ডিভোর্স পেয়েছি। সেইদিন শুটিং' এর পরই আমি সোজা আলিপুরের বাড়িতে চলে গেলাম।

আমি একটু হেসে বলি, চাকলাদার সাহেব মাঝে মাঝে রিপোর্টারদের জন্য যে পার্টি দিতেন, তা তোমার মনে আছে?

—খুব মনে আছে।

—আমি সেই' পার্টিতেই তোমাকে প্রথম দেখি।

ও এক গাল হেসে বলে, তুমিও সেই পার্টিতে যেতে?

—জী হাঁ মেমসাব!

একটু থেমে বলি, একবার তোমার জন্মদিন উপলক্ষে উনি যে বিশাল

পার্টি দিয়েছিলেন, তার কথা আমি কোনদিন ভুলব না।

চৈতালী মুখ নীচু ক'রে বলে, পি. এন. কোন ছোট-খাটো ব্যাপারই পছন্দ করতো না। তাছাড়া যেমন লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করতো, সেইরকমই খরচ করতেও পারতো।

—হ্যাঁ, তা আমি জানি।

—পি. এন' এর কথা ভাবলে আমি যেমন অবাক হয়ে যাই, সেইরকমই দুঃখ হয়।

—কেন?

—শুধু নিজের ত্রুটির জন্য ও জীবনে কখনো সুখী হতে পারলো না।

দু' এক মিনিট চুপ করে থাকার পর বলি, তুমি ওঁকে বিয়ে করলে না কেন?

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, দ্যাখো বাচ্চু, ঐ কয়েক বছর সিনেমা লাইনে থেকেই আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, অন্যান্য অনেক অভিনেত্রী যেমন কোন না কোন লোকের রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটিয়েছেন বা কাটাচ্ছেন, আমি কখনই তা হতে পারবো না। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমি কোন পুরুষের কৃপাপ্রার্থী বা গোলাম হয়ে থাকবো না। পুরুষরা যেন আমার কৃপাপ্রার্থী হয়।

—পি. এন'কে বিয়ে করলে না কেন?

—প্রথম দিকে ও আমাকে নিয়ে এত মাতামাতি করতো যে একবার মনে হয়েছিল, বিয়ে করি কিন্তু তারপর বুঝেছিলাম, বিয়ে করছি না বলেই ও আমাকে খুশি করার জন্য এতকিছু করছে। বিয়ে করলেই আমাকে গোলাম হয়ে থাকতে হবে।

—আলিপুরের বাড়িটা কি তুমি কিনেছিলে নাকি....

আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই ও একটু হেসে বলে, বাচ্চু, এই বাড়িটার ব্যাপারে যে বাজারে অনেক কাহিনী চালু আছে, তা আমি জানি। তুমিও হয়তো মনে করো, আমি পি. এন'কে বশ করে কোন দুর্বল মুহূর্তে বাড়িটা আমার নামে করে নিয়েছি কিন্তু তা সত্যি না।

আমি কোন মন্তব্য করি না।

চৈতালীই আবার বলে, পি. এন. কাঁচা লোক ছিল না। তাছাড়া আমিই ওর জীবনে এক মাত্র প্রেমিকা ছিলাম না। কলকাতা শহরের বেশ কয়েকটি খানদানী পরিবারের চার-পাঁচজন মেয়ে-বউও ওর প্রেমিকা ছিল। ঐ মেয়ে-বউরা আমার চাইতে কম বুদ্ধিমতী ছিলেন না। যদি সম্ভব হতো, তাহলে ওরাও সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে পারতো।

আমি হাসতে হাসতেই বলি, স্বীকার করলাম, তুমি হাতিয়ে নাও নি কিন্তু তোমার সারাজীবনের রোজগার দিয়েও তো ঐ বাড়ি কেনা সম্ভব না।

ও খুব আস্তে আস্তে বলে, কিনেছিলাম, তবে জলের দামে।

আমি চাপা হাসি হেসে বলি, তাহলে বাজারে যে গুজব চালু আছে, তা অর্ধেক সত্যি?

ও বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে সঙ্গে সঙ্গে বলে, যে পুরুষ আমার মধু খাবার জন্য পাগল, একেবারে খালি হাতে তো নিজেকে তার কাছে বিলিয়ে দিতে পারি না।

ও সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলে, কিছু খেসারত তো তাদের দিতেই হবে।

—গুড! এই জন্যই তো তোমাকে আমি উর্বশী বলি।

একটু থেমেই আমি বলি, চাকলাদার সাহেবের কথা অনেক হয়েছে। এবার বলো, এর পর কে তোমার মধু খাবার জন্য পাগল হয়েছিলেন?

চৈতালী একটা সিগারেট ধরিয়ে আপনমনে হাসে আর কি যেন চিন্তা করে।

বেশ কয়েক মিনিট পরে ও বলে, সে এক মজার ঘটনা। তখন অশোক কুমারের নিজস্ব প্রোডাকশনের একটি ছবিতে কাজ করছি। পরিচালক নীতিন বসু আর অশোক কুমার নিজেই ছবির হিরো।

—আর তুমি নায়িকা?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, তখন অশোক কুমার আরো কয়েকটি ছবির কাজ নিয়ে ব্যস্ত ; এদিকে আমিও নানা ছবির কাজে বেশ ব্যস্ত। তবু মাসে দু'

তিনবার বোম্বে যাই ঐ ছবির কাজে। একবার বোম্বে যাবার সময় প্লেনে যে শিখ ভদ্রলোক আমার পাশে বসেছিলেন, ফেরার সময় আবার তার সঙ্গে দেখা।

—সেবারও কি উনি তোমার পাশের সীটে বসেছিলেন?

—না, অন্য সীটে। তবে উনি আমাকে দেখেই উইস করলেন ; আমিও ওকে উইস করি।

—তারপর?

—মাস দেড়েক পর আবার বোম্বে যাবার সময় দমদম এয়ার পোর্টে ওর সঙ্গে দেখা। দু'জনেই দু'জনকে দেখে হাসি। উনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে দু'টো পাশাপাশি সীটের ব্যবস্থা করলেন।

—ভদ্রলোক কি ইয়াং ম্যান ছিলেন?

—না, না ; তখন দেখে মনে হয়েছিল, বোধহয় চল্লিশ হবে।

—প্লেনে আলাপ হলো?

—তুমি তো জানো, আমি হিন্দী বা ইংরেজি কোনটাই ভাল জানি না। এখন তবু একটু-আধটু বলতে পারলেও তখন একেবারেই পারতাম না। তাই ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বেশ দ্বিধা করছিল। তারপর হঠাৎ উনি...

—আপনি আউর অশোক কুমার যে ছবি করছেন, তা কবে রিলিজ করবে?

চৈতালী অবাক হয়ে বলে, আপনি বাংলা জানেন?

উনি একটু হেসে বলেন, হ্যাঁ, থোড়া থোড়া। অ্যাট লিস্ট মাসে দু'বার করে কলকাতা আর বোম্বে আসতেই হয়। তাই থোড়া থোড়া বেঙ্গলী আর মারাঠী শিখেছি।

—আপনি কোথায় থাকেন?

—আমার হেড কোয়ার্টার্স দিল্লী আছে মগর মাসে চার-পাঁচ রোজের বেশি সেখানে থাকি না।

বেশ কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ প্যাসেঞ্জার চৈতালীর অটোগ্রাফ নেয়। দু'জন এয়ার হোস্টেস এসে আলাপ করে, অটোগ্রাফ নেয়। এরই মধ্যে প্লেন

পৌঁছে যায় বোম্বে। অশোক কুমার প্রোডাকশনের লোকজন প্রায় ছোঁ মেরে চৈতালীকে গাড়িতে তুলেই চলে যায় তাজ।

রিসেপশন কাউন্টারে প্যাসেঞ্জার রেজিস্টারে সই করার পর হোটেলের চার-পাঁচজন কর্মীকে অটোগ্রাফ দিতেই হাজির পাশের সীটের সর্দারজী।

উনি এক গাল হেসে বলেন, ম্যাডাম, উই মীট এগেন!

চৈতালী শুধু একটু হাসে। মুখে কিছু বলে না।

চৈতালীকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে বিদায় নেবার সময় প্রোডাকশন ম্যানেজার মিঃ দেশপাণ্ডে বলেন, ম্যাডাম, কাল ঠিক ন'টায় আপনাকে পিক আপ করা হবে।

—ঠিক আছে ; আমি তৈরি থাকব।

—যদি দরকার হয়, কাইন্ডলি আমাকে ফোন করবেন।

চৈতালী একটু হেসে বলে, না, না, দরকার হবে না।

—মিঃ আত্রেকে রেখে যাচ্ছি। রিসেপশনে ফোন করলেই পাঠিয়ে দেবে। তাছাড়া যে গাড়িতে এয়ারপোর্ট থেকে এসেছেন, সেই গাড়িটাও থাকল।

—শুধু শুধু কেন আত্রেকে আটকে রাখছেন? গাড়িও লাগবে না। আমি কোথাও বেরুব না।

—না, না, তা হয় না। আত্রেও থাকবে, গাড়িও থাকবে।

ওরা চলে যাবার পর চৈতালী চেঞ্জ করে বারান্দায় এসে বসে। সামনের আরব সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকে আর মনে মনে কত কি চিন্তা করে। হঠাৎ টেলিফোনের ঘণ্টা শুনেই চৈতালী ঘরে যায়, রিসিভার তুলে কানে দেয়।

অপারেটর বলেন, ম্যাডাম, মিঃ অশোক কুমার। স্পীক হিয়ার!

অশোক কুমার বলেন, কি চৈতালী, ভাল আছো তো?

—হ্যাঁ, দাদামণি, ভাল আছি। আপনি ভাল আছেন তো?

—হ্যাঁ, ভাই, ভালই আছি।

উনি সঙ্গে সঙ্গে বলেন, কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো?

—না, না, কোন অসুবিধে হচ্ছে না।

—দরকার হলে আমাকে ফোন করতে দ্বিধা করো না।

—দরকার হলে নিশ্চয়ই ফোন করবো।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রেখে বারান্দায় বসতে না বসতেই আবার ফোন।

—ম্যাডাম, মিঃ আলুওয়ালিয়া! স্পীক হিয়ার।

মিঃ আলুওয়ালিয়া বলেন, চিনতে পারছেন? একই ফ্লাইটে এলাম, রিসেপশনেও দেখা হলো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন।

—ডিনার করবেন তো?

—হ্যাঁ, একটু কিছু তো খেতেই হবে।

—আপনার আপত্তি না থাকলে আমরা এক সঙ্গে ডিনার করতাম।

—আমি হাফ্ ডে শুটিং করেই প্লেন ধরেছি! বেশ টায়ার্ড। ঘর থেকে বেরুতে ইচ্ছে করছে না।

—ম্যাডাম, আপনার ঘরে তো আমার যাওয়া ঠিক হবে না! তাই বলছিলাম,

—না, না, সেরকম কোন ব্যাপার নেই। তবে....

—না, ম্যাডাম, আমি আপনার ঘরে যাবো না। আপনার সঙ্গে আমার সেরকম বন্ধুত্ব হয় নি। একটু কষ্ট করে রেস্টুরেন্ট চলুন। একলা একলা ঘরে বসে কি করবেন?

চৈতালী আমার দিকে তাকিয়ে বলে, মনে মনে ভেবে দেখলাম, যে ভদ্রলোক হরদম প্লেনে কলকাতা-দিল্লী-বোম্বে ঘুরে বেড়ান, তাজমহল হোটেলে থাকেন, তিনি নিশ্চয়ই সাধারণ মানুষ না।

ও একটু থেমে বলে, তাছাড়া মনে হলো, ঘরে বসে থেকে করবো কি?

—এক সঙ্গে ডিনার হলো?

—হ্যাঁ।

—ডিনারের আগে দু'এক গেলাস কারণ সুধা?

ও একটু হেসে বলল, হ্যাঁ, দু'জনেই হাঙ্গেরিয়ান ওয়াইন খেলাম।

—ভদ্রলোক কি চাকলাদার সাহেবের মত ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট্র ছিলেন?

—না ; উনি ছিলেন হিমালয়ান ইন্সুরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিঃ

—হ্যাঁ, এক কালে বিরাট কোম্পানী ছিল।

—তবে আলুওয়ালিয়া সত্যি খুব শিক্ষিত মানুষ ছিল। ওর ভিজিটিং কার্ড দেখে তো আমার চক্ষু ছানাবড়া।

—কেন?

—বিলেত-আমেরিকার সাত-আটটা ডিগ্রী ছিল।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

চৈতালী একটু থেমে বলে, সেবার স্টুডিও থেকে ফিরে পর পর পাঁচদিন আমরা একসঙ্গে ডিনার খেয়েছি, গল্প গুজব করেছি, কিন্তু কখনই উনি কোন অসংযত ব্যবহার করতেন না। দু' পেগের বেশি হুইস্কী খেতেন না বা কখনই নিজের খ্যাতি-অর্থ জাহির করতেন না।

—তারপর আবার কবে তোমাদের দেখা হলো?

—আমার শুটিং চলতে চলতেই ও দিল্লী থেকে ঘুরে এলো। তারপর আমরা এক সঙ্গেই কলকাতায় আসি।

—উনি তোমার বাড়িতে এসেছিলেন?

—হ্যাঁ, আমিই ওকে একদিন ডিনারে নেমন্তন্ন করি।

ও থামতেই আমি বলি, উর্বশী, বলে যাও, বলে যাও। থামছো কেন?

ও একটু হেসে বলে, না, না, থামছি না। এক-দেড় মাস অন্তর আমাদের দেখা হতো। কখনো ও আমার বাড়িতে ডিনারে আসতো, কখনো আমি গ্রান্ডে যেতাম ওর সঙ্গে ডিনার করতে। এইভাবে বছর খানেক কেটে গেল।

চৈতালী প্রতিদিন শুটিং করতে করতে ক্লান্ত বোধ করে। তাই তো কয়েক দিন নিছক শুয়ে-বসে কাটাবার জন্য চলে যায় শিলং। ওঠে পাইনউড হোটেলে। ঐ হোটেলে অপ্রত্যাশিতভাবে মিঃ আলুওয়ালিয়ার সঙ্গে দেখা।

—মাই গড! ম্যাডাম, আপনি এখানে?

—হ্যাঁ। মাসের পর মাস প্রত্যেকদিন শুটিং করতে করতে ভীষণ টায়ার্ড হয়ে গেছি। তাই ক'দিন চুপচাপ বিশ্রাম করবো বলে এখানে এসেছি।

চৈতালী সঙ্গে সঙ্গেই বলে, আপনি এখানে কেন?

—এখানে আমরা ব্রাঞ্চ অফিস খুলছি। তাই এসেছি।

—ক'দিন থাকবেন?

—পরশু সকালেই গৌহাটি যাবো। ওখানে একদিন থেকেই কলকাতা হয়ে দিল্লী ফিরব।

মিঃ আলুওয়ালিয়া আবার জিজ্ঞেস করেন, আপনি ক'দিন থাকবেন?

—দিন দশেকের আগে কলকাতা ফিরছি না।

সেদিন সন্ধের পর চৈতালীর সঙ্গে গল্পগুজব করতে করতেই মিঃ আলুওয়ালিয়া বলেন, ম্যাডাম, বন্ধু হিসেবে আপনাকে দু'একটা কথা বলতে পারি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন।

—দেখুন ম্যাডাম, আপনি বেঙ্গলী ফিল্মের নাম্বার ওয়ান হিরোইন। হাতে অনেক ছবি। রোজ স্টুডিও যান, প্রডিউসার-ডিরেক্টরদের রোজই দেখা হয় কিন্তু তা বোধহয় উচিত না।

চৈতালী অবাক হয়ে বলে, কেন?

—আপনি হিরোইন; নিজের গুরুত্ব বাড়াবার জন্য নিজের ইমেজ ঠিক রাখার জন্য আপনার কিছু করা উচিত।

—আমি তো মনে করি, ঠিকই করছি কিন্তু আপনার মতে আমার কি করা উচিত?

মিঃ আলুওয়ালিয়া একটু হেসে বলেন, হঠাৎ মাঝে মাঝে অনেক দূরে চলে যাবেন; আই মীন, যেখানে বেঙ্গলী ফিল্মের অন্য হিরো-হিরোইনরা যায় না বা যাবার কথা ভাবতে পারে না।

—যেমন?

উনি একটু হেসে বলেন, শিলং'এর বদলে যদি আপনি সুইজারল্যান্ডে ছুটি কাটাতেন, তাহলে দেখতেন, বেঙ্গলী ফিল্ম সার্কেলে কত দাম বেড়ে

গেছে, সবাই কত খাতির করছে।

চৈতালী একটু হেসে বলে, তা ঠিক কিন্তু...

ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়েই মিঃ আলুওয়ালিয়া একটু হেসে বলেন, আপনি যদি ইউরোপে যেতে চান, প্লীজ আমাকে বলবেন। আপনাকে কিছু চিন্তা করতে হবে না। ইউ উইল বী মাই গেস্ট।

চৈতালী অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায়।

—অবাক হচ্ছেন কেন? আমি সিরিয়াসলিই কথাটা বলেছি।

উনি একটু থেমে বলেন, আপনার দু'চার সপ্তাহের ইউরোপ সফর নিয়ে যখন কলকাতার পত্র-পত্রিকায় ছবি বা রিপোর্ট ছাপা হবে, তখন বেঙ্গলী ফিল্ম সার্কেলে আপনার প্রেস্টিজ বেড়ে যেতে বাধ্য।

একটু চুপ করে থাকার পর চৈতালী প্রশ্ন করে, কিন্তু আপনি আমার জন্য এত খরচ করবেন কেন?

—আমি কি আপনার বন্ধু না?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

—তাহলে প্লীজ খরচের কথা বলবেন না।

উনি একটু থেমে বলেন, আমি আমার ট্রাভেল এজেন্সীকে বলে দেব। ওরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে পাসপোর্ট ফর্ম সই করিয়ে নেবে কিন্তু ফিল্ম লাইনের কেউ যেন কিছু জানতে না পারে।

লন্ডন, প্যারিস, জেনেভা, জুরিখ, ফ্রাঙ্কফুর্ট, বন, রোম, এথেন্স....

মুহূর্তের জন্য এইসব শহরের নাম মনে পড়তেই চৈতালী রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। মনে মনে স্বীকার করে, ইউরোপ ঘুরে এলে প্রডিউসার-ডিরেক্টর থেকে শুরু করে অভিনেতা, ক্যামেরাম্যান, সাউন্ড রেকর্ডিস্ট সবাই ওকে একটু বেশি খাতির করতে বাধ্য হবেন। সাধারণ বাঙ্গালী দর্শকরাও বুঝবে, চৈতালী রায় অন্য ধরনের অভিনেত্রী। অন্য অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মত পুরী বা দার্জিলিং'এ ছুটি কাটিয়েই খুশি থাকার পাত্রী না। তাছাড়া সবাই বুঝবে, অন্যদের চাইতে ওর আয় অনেক বেশি, অনেক বেশি টাকা নিয়ে উনি ছবি করেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসব দরকার আছে বৈকি! হাজার হোক সিনেমা তো শো বিজনেস!

চৈতালী গম্ভীর হয়ে বলল, আলুওয়ালিয়ার কথাটা আমার মনে ধরল। তাইতো মাস তিনেক পর একদিন উড়ে গেলাম বোম্বে। তারপর বম্বে থেকে আমরা দু'জনে ইউরোপের পথে প্রথমে গেলাম কায়রো। উঠলাম নাইল নদীর পাড়ের নাইল হিলটনে।

—পিরামিড-স্ফিনক্স্ দেখেছিলে?

—নিশ্চয়ই।

—আলেকজান্ড্রিয়া গিয়েছিলে?

—না, ওখানে যাবার সময় ছিল না।

একটু হেসে বলি, নাইট ক্লাবে গিয়েছিলে?

ও একটু হেসে জবাব দেয়, হ্যাঁ গিয়েছি।

—নাইল হিলটনের বেলভিডিয়ার রুমে নাকি সাহারা সিটি?

—সব নাইট ক্লাবেই বোধ হয় তুমি গিয়েছ, তাই না?

—ওখানে তো তুমি ছিলে না। তাই বাধ্য হয়ে....

—আচ্ছা, আচ্ছা শোনো।

চৈতালী একটু থেমে বলে, তারপর একে একে আমরা ঘুরেছি এথেন্স, মিলান, রোম, বার্লিন, প্যারিস, জেনেভা. জুরিখ আর লন্ডন।

—সব জায়গা ভাল ভাবে ঘুরেছিলে?

—যেমন ভালভাবে ঘুরেছি-ফিরেছি, সেইরকমই আরামে থেকেছি।

আমি গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করি, শুধু কি আরামেই থেকেছ নাকি আনন্দেও থেকেছ?

ও চাপা হাসি হেসে বলে, অসভ্য কোথাকা'র!

—আরে বাপু, আলুওয়ালিয়া তো সন্ন্যাসী ছিলেন না? তাছাড়া তোমার মত সর্বনাশী উর্বশী রয়েছে সঙ্গে।

—হ্যাঁ, আমরা আনন্দও করেছি।

চৈতালী গম্ভীর হয়ে বলে, দ্যাখো বাচ্চু, আমি দেবতা না। রক্ত-মাংসের মানুষ। নিশ্চয়ই আমার কামনা-বাসনা আছে। তাইতো যখন মন চেয়েছে আর পছন্দের মানুষকে কাছে পেয়েছি, তখন কেন আনন্দ করবো না?

ও একটু হেসে বলে, তবে হরিবাবু ছাড়া আর কেউ জোর করে আমার

মধু খেতে পারেনি, সাহসও করেনি।

—সেটা নিশ্চয়ই তোমার কৃতিত্ব।

একটা সিগারেট ধরিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে চৈতালী বলল, আলুওয়ালিয়া ঠিকই বলেছিল। ইউরোপ ঘুরে আসার পর দেখি, কায়রো, লন্ডন, প্যারিস, জেনিভা, বার্লিন, রোম ও আরো দু' একটা জায়গা থেকে আমার যে ছবিগুলো পাঠানো হয়েছিল, তা কলকাতার সব কাগজে ছাপা হয়েছে।

—সে তো হবেই।

—ঐ পাবলিসিটি আমাকে খুব সাহায্য করেছিল।

—ছবির রেট আরো বাড়িয়ে দিলে?

—হ্যাঁ, তিরিশ থেকে পঞ্চাশ করলাম কিন্তু প্রডিউসাররা একটা শব্দ উচ্চারণ করলো না।

আমি একটু হেসে বলি, তোমাকে পঞ্চাশ হাজার দিয়েও যদি ওরা লাখ লাখ টাকা আয় করে, তাহলে আপত্তি করবে কেন?

একটু থেমে বলি, হিমালয়ান ইন্সুরেন্স কোম্পানী তো কলকাতাতেও বিরাট অফিস খুলেছিল।

—হ্যাঁ, আমিই তার উদ্বোধন করি।

—হ্যাঁ, আমার মনে আছে। কলকাতার সব খবরের কাগজেই সে ছবি ছাপা হয়েছিল।

—হ্যাঁ।

ও একটু হেসে বলে, ঐ উদ্বোধন অনুষ্ঠানেই ওরা কয়েক লাখ টাকার বিজনেস পায়।

—তোমার আলিপুরের বাড়ির একতলা তো মিঃ আলুওয়ালিয়া ভাড়া নিয়েছিলেন, তাই না?

চৈতালী ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করে, তুমি জানলে কি করে?

আমি একটু হেসে বলি, ভুলে যাও কেন আমি জার্নালিস্ট? সব খবর ছাপতে না পরলেও অনেক খবরই আমাদের রাখতে হয়।

ও গম্ভীর হয়ে বলে, আলুওয়ালিয়া নিজে ভাড়া নেয়নি, ভাড়া নিয়েছিল

ওর কোম্পানী। তবে শুধু আলুওয়ালিয়াই কলকাতায় এলে ওখানে থাকতো; অন্য কেউ না।

আমি মুখে কিছু বলি না। শুধু একটু হাসি।

—হাসছো কেন? আমাদের সম্পর্কের কথা ভেবে?

আমি কিছু বলার আগেই ও বলে, হ্যাঁ, বছর তিনেক আমাদের সম্পর্কটা খুবই ক্লোজ ছিল।

—তিন বছর পর সম্পর্ক ভেঙে গেল কেন?

—ওদের কোম্পানী নানা কারণে উঠে যায়। তাছাড়া গভর্নমেন্ট ইন্সুরেন্স কোম্পানিগুলো ন্যাশনালাইজ করলো বলে আলুওয়ালিয়া নাইরোবি চ'লে যায়।

—ও!

চৈতালীর সঙ্গে আমি তর্ক-বিতর্ক করলাম না কিন্তু সাংবাদিক হিসেবে অনেক কিছু জেনেছি। হিমালয়ান ইন্সুরেন্স কোম্পানী ওর বাড়ির এক তলা ভাড়া নিয়েছিল মাসিক দশ হাজার টাকায়। শুধু তাই না। নিছক বান্ধবীকে খুশি করার জন্য দশ বছরের ভাড়া অগ্রিম দিয়েছিলেন। মজার কথা, কাগজপত্রে ভাড়া লেখা ছিল মাত্র এক হাজার।

এখানেই শেষ নয়। আলুওয়ালিয়া কলকাতার খদ্দেরদের গাড়ির দুর্ঘটনার জাল কাগজপত্র তৈরি করে কোম্পানী থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে চৈতালীর কাছে জমা রাখতেন। মাঝে মধ্যে সে টাকা থেকে উনিও কিছু নিতেন। চৈতালীর কাছে টাকা রাখার একটাই উদ্দেশ্য ছিল ; যদি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট ওঁর ঘর দোর তল্লাশি করে, তাহলে যেন বিশেষ কিছু না পায়।

স্বয়ং অর্থমন্ত্রী পার্লামেন্টে বলেছিলেন, হিমালয়ান ইন্সুরেন্স কোম্পানীর কলকাতার আঞ্চলিক অফিস গাড়ি ও কারখানার দুর্ঘটনা বা অগ্নি সংযোগের জাল কাগজপত্র তৈরি করে মিঃ আলুওয়ালিয়া প্রায় দেড় কোটি টাকা আত্মসাৎ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেছেন।

আমার ধারণা এই টাকার একটা ভাল অংশ চৈতালীর কাছে রাখা ছিল ও সে ঐ টাকা ফেরত দেয়নি। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট চৈতালীর বিরুদ্ধে

তদন্ত শুরু করেও এগুতে পারেনি।

একটু চুপ করে থাকার পর চৈতালী একটু হেসে বলে, তোমাদের দিল্লীর এক মন্ত্রীও আমার প্রেমে হাবুডুবু খেয়েছিলেন, তা জানো?

আমিও একটু হেসে বলি, আমি কি করে জানবো?

—আমার বেডরুমে একটা টেলিফোন আছে। ঐ টেলিফোনের নম্বর বাইরের কেউ জানে না। কারুর সঙ্গে খুব প্রাইভেট কথাবার্তা বলতে হলে আমি ঐ টেলিফোন ব্যবহার করি কিন্তু বাইরে থেকে কোন ফোন আসে না।

ও একটু হেসে বলে, রাত তখন দশটা হবে। আমি শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছি। হঠাৎ টেলিফোন! সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, কেউ বোধহয় ভুল করে আমার নম্বরটা ডায়াল করেছে, কিন্তু তুলে দেখি, মন্ত্রীমশাই!

শুনে আমি হাসি।

—হাসছ কি? সত্যি আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। হাজার হোক উনি দিল্লীর মন্ত্রী আর আমি সামান্য একজন অভিনেত্রী।

চৈতালী একটু থেমে বলে, আমাদের সিনেমা লাইনের লোকজন স্টুডিও পাড়ায় যতই মাতব্বরী করুক, মন্ত্রী বা বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে কথা বলতেও ভয় করে।

—ভয় করার কি আছে?

—ঠিক ভয় না করলেও ওদের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলতে বা মিশতে পারি না।

—যাই হোক মন্ত্রীমশাই কি বললেন, তাই বলো।

ও একটু হেসে বলে, বললেন, আমাকে খুব ভাল লাগে। আমাকে ভালবাসেন। আমার কথা মনে পড়লে কিছুতেই ঘুম আসে না।

—আর কি বললেন?

—আমাকে না দেখে থাকতে পারছেন না।

—তুমি কি বললে?

—বললাম, এখুনি চলে আসুন আমার বাড়িতে।

—এসেছিলেন?

চৈতালী আমার একটা হাত চেপে ধরে বলে, তুমি ভাবতে পারো বাচ্চু? উনি ট্যাক্সি নিয়ে আমার বাড়িতে হাজির।

আমি হাসতে হাসতে বলি, তোমার মত ভূত যার ঘাড়ে চেপেছে, সে হাসি মুখেও গলায় দড়ি দিতে পারে।

একটু থেমে বলি তোমার কর্মচারীরা ওকে দেখে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিল?

—রাত ন'টায় আমার সব কাজের লোক চলে যায়।

—দারোয়ান তো থাকে?

—ও নেপালী ; ও আর ক'জনকে চিনবে।

—মন্ত্রী মশাই এসে কি বললেন?

ও হাসতে হাসতে বলে, উনি আমাকে দেখে, কাছে পেয়ে যে কি পাগলামী শুরু করলেন, তা ভাবতে পারবে না।

আমি মুখ টিপে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করি, সারারাত ছিলেন?

—হ্যাঁ, ছিলেন।

—মধু পান করেছিলেন?

—মধু পান করার জন্যই তো এসেছিলেন।

ও হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে, এই ধরনের বিখ্যাত লোকেরা যখন কাঙালের মত আমার কাছে ভিক্ষা চায়, তখন তাদের কৃপা দেখিয়ে আমি মনে মনে খুব শান্তি পাই। একজন সেন্ট্রাল মিনিস্টার ভোর সাড়ে চারটে-পাঁচটার সময় যখন চোরের মত আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তা থেকে ট্যাক্সি ধরে ফিরে গেলেন, তখন যে আমার কি আনন্দ হয়েছিল, তা বলতে পারবো না।

—উনি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে আসতেন?

—হ্যাঁ, আসতেন।

—মন্ত্রী মশায়ের সঙ্গে বাইরে কোথাও যাওনি?

— আমাকে নিয়ে ওঁর পক্ষে দেশের মধ্যে কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না বলেই একবার উনি আমাকে নিয়ে সিঙ্গাপুর আর হংকং গিয়েছিলেন।

—একটা প্রশ্ন করবো?

—হ্যাঁ বলো।

—আলুওয়ালিয়া হঠাৎ দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর ওদের ইন্সুরেন্স কোম্পানীর নানা গণ্ডগোলের ব্যাপারে ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট বোধ হয় তোমার পিছনেও লেগেছিল কিন্তু...

আমার কথা শেষ হবার আগেই চৈতালী গম্ভীর হয়ে বলে, হ্যাঁ, এই মন্ত্রীমশাইকে দিয়েই সে ঝামেলা মিটিয়েছিলাম।

একটু হেসে বলি, তুমিই বলেছ, যাঁরা তোমার ঘনিষ্ঠ হয়েছেন, মধু খেয়েছেন, তাঁদের বেশ কিছু খেসারত দিতে হয়েছে। এই মন্ত্রীমশায়ের কাছ থেকেও খেসারত আদায় করেছিলে তো?

ও একটু বিদ্রূপের হাসি হেসে বলে, আমি পেশাদারী অভিনেত্রী। টাকার বিনিময়ে হাসি, কাঁদি, প্রেম করি। এই মানুষগুলোর সঙ্গে শুধু প্রেমের অভিনয় করি না, নিজের দেহটাকেও দিতে হয়। সুতরাং সুদে-আসলে আমি পুষিয়ে নিই বৈকি।

সাত

সেদিন সন্ধের পর আমরা দু'জনে হুইস্কী খেতে খেতে টুকটাক গল্পগুজব করছিলাম। হঠাৎ ওর একটা মন্তব্য শুনেই আমি বললাম, উর্বশী, তুমি বড্ড অহংকারী। তাছাড়া তুমি বড় নিষ্ঠুর। প্রতিশোধ না নিয়ে তুমি শান্তি পাও না।

চৈতালী হুইস্কীর গেলাসে এক চুমুক দিয়ে একটু হেসে বলল, হ্যাঁ, আমি অহংকারী, নিষ্ঠুর। আমার মনের মধ্যে সব সময় প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছে।

ও হঠাৎ একটু গলা চড়িয়ে বলে, আগে তো আমি এ রকম ছিলাম না কিন্তু কেন আমি বদলে গেলাম তা কি ভেবে দেখেছ?

আমি কোন মন্তব্য করি না।

ও আপনমনে বলে যায়, অল্প বয়সেই বুঝতে পারি, পুরুষরা আমাকে আদর করতে, ভালবাসতে চায়। বিয়ের পর যে উদয় প্রতিদিন রাত্রে আমাকে নিয়ে পাগলের মত আনন্দ করতো, উপভোগ করতো, সেই উদয়ই পরবর্তীকালে আমাকে সব চাইতে বেশি অপমান আর উপেক্ষা করেছে!

ও হুইস্কীর গেলাসে আবার চুমুক দেয়। সিগারেট ধরায়। তারপর বলে, বাচ্চু, যদি মেয়েরা স্বামীর আদর ভালবাসা পায়, তাহলে তারা হাসিমুখে শ্বশুর-শাশুড়ি-ননদদের অত্যাচার উপেক্ষা করতে পারে কিন্তু আমার মত যে মেয়ে একই সঙ্গে স্বামী আর শাশুড়ির অত্যাচার সহ্য করেছে, সে তো নিষ্ঠুর না হয়ে পারে না।

ও একটু থেমে একটু হেসে বলে, উদয় আর হরিবাবুর জন্যই আমি

পুরুষদের ব্যাপারে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়েছি। যে পুরুষই আমার দিকে হাত বাড়ায়, আমি তার সর্বনাশ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করি না।

—খুব ভাল কথা কিন্তু তুমি এক অহংকারী কেন?

আমি এক নিঃশ্বাসে বলে যাই, তোমার কি ধারণা, তোমার মত সুন্দরী, তোমার মত অভিনেত্রী, তোমার মত ধনী ভূ-ভারতে নেই?

চৈতালী সিগারেটে একটা টান দিয়ে একটু হেসে বলে, তোমার কাছে আমি কি অহংকার দেখিয়েছি?

—আমাকে কেন অহংকার দেখাবে? আমি তোমার ফিল্ম জগতেরও লোক না, তোমার কৃপাপ্রার্থীও না।

—যে লোকজনের সঙ্গে আমার নিত্য ওঠা-বসা করতে হয়, তাদের সঙ্গে দূরত্ব রাখার জন্যই আমাকে অহংকারী দাম্ভিকের মুখোশ পরে থাকতে হয়।

—শুধু কি তাই?

আমি মুহূর্তের জন্য থেমে বলি, সৎ অসৎ উপায়ে প্রচুর টাকা করেছ বলেও কি তুমি কম অহংকারী?

ও একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, মাই ডিয়ার বাচ্চু, তারও কারণ আছে।

ও হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বলে, স্কুল শিক্ষিকা বা কলেজের অধ্যাপিকা হলে নিশ্চয়ই এ ধরনের অহংকারী হবার প্রয়োজন হয় না কিন্তু ফিল্মের হিরো-হিরোইনদের এই ধরনের অহংকার দেখাতেই হয়।

চৈতালী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তাছাড়া আরো একটা কারণ আছে।

—কি?

—এক কালে সামান্য একটু ক্রীম কেনার জন্যও উদয়েব কাছে হাত পাততে হতো। আমি হাজার হাজার টাকা আয় করলেও আমার কাছে একটি পয়সা থাকতো না বলেই বাবা বা ছোট মা'কে একটা কাপড় পর্যন্ত দিতে পারিনি।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, সেই সব দুঃখের জ্বালা মেটাবার জন্যই বোধ হয় একটু অহংকারী হয়েছি। লোকজনকে দেখাতে চাই যে আমি কারুর কৃপাপ্রার্থী না।

আমাদের হুইস্কীর গেলাস আবার ভর্তি করা হয়। দু'জনেই গেলাসে

চুমুক দিই ; দু'জনেই সিগারেট ধরাই। তারপর জিজ্ঞেস করি, গজানন আগরওয়ালও কি চাকলাদার সাহেবের মত....

চৈতালী আমার কথার মাঝখানেই বলে, বহু পুরুষই চায় সিনেমার অভিনেত্রীদের নিয়ে স্ফূর্তি করতে কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু পুরুষই এগিয়ে আসতে সুযোগ পায় বা সাহস করে।

ও না থেমেই বলে, আরো একটা কথা জেনে রেখো। যাদের অনেক টাকা-কড়ি, সমাজে বেশ খ্যাতি-যশ হয়েছে, তারা মধ্য বয়সে পৌঁছে নতুন আনন্দ উত্তেজনা পাবার জন্য নানা ধরনের খেয়াল খুশিতে মেতে ওঠেন।

—গজাননবাবু কি....

—গজাননের অনেক টাকা। ও সব ব্যবসাতেই সাকসেসফুল। কোন ব্যবসা নিয়েই দুশ্চিন্তা নেই। আঠারো বছর বয়সে যে কিশোরীকে বিয়ে করেছিল, তাকে দিয়ে আর মন ভরে না।....

আমি একটু হেসে বলি, তাই তোমার দিকে হাত বাড়ালেন?

ও একটু হেসে বলে, ও বেশ নাটকীয়ভাবেই আমার কাছে এসেছিল।

—নাটকীয়ভাবে মানে?

—বলছি।

—হ্যালো, আমি চৈতালী রায়!

—নমস্কার! আমি পুলিশ কমিশনার।

—হ্যাঁ, বলুন।

—গজানন আগরওয়াল একজন শিপিং ম্যাগনেট। জাহাজ কোম্পানী ছাড়া ওঁর আরো অনেক ব্যবসা আছে। উনি আমাদের বিশেষ পরিচিত। উনি আপনার সঙ্গে একটু দেখা করতে চান।

—কি ব্যাপারে?

—বোধহয় সিনেমা সংক্রান্ত ব্যাপারে।

—উনি কবে দেখা করতে চান?

—দু'চার দিনের মধ্যে হলেই ভাল হয়।

—সকালের দিকে তো আমার বাড়িতে রোজই বেশ কিছু প্রডিউসার-ডিরেক্টার আসেন। তখন তো আমার সময় হবে না। স্টুডিও থেকে বাড়ি

ফিরতে সাতটা-সাড়ে সাতটা হয়েই যায়।

চৈতালী একটু থেমে বলে, তাছাড়া তখন এত টায়ার্ড থাকি যে....

—রবিবার?

—হ্যাঁ, রবিবার হতে পারে।

—কখন যেতে বলব?

—সকালে তো যথারীতি ভীড় থাকবে। উনি যেন সন্ধে সাড়ে ছ'টায় আসেন।

—তাহলে রবিবার সন্ধে সাড়ে ছ'টা, তাই তো?

—হ্যাঁ।

—অশেষ ধন্যবাদ।

রবিবার।

ঠিক সাড়ে ছ'টার সময় গজাননবাবুর মার্সিডিজ চৈতালীর বাড়িতে ঢোকে।

দোতলায় সিঁড়ির মুখে চৈতালী ওকে অভ্যর্থনা করতেই গজাননবাবু একটু হেসে ফুলের তোড়া ওর হাতে তুলে দেন।

ব্রীফ কেস হাতে নিয়ে ড্রইং রুমে পা দিয়েই গজাননবাবু একবার চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিয়েই বলেন, বিউটিফুল। ঘরে পা দিয়েই বোঝা যায়, এ বাড়ির বাসিন্দা একজন অসাধারণ রুচিসম্পন্না মহিলা।

চৈতালী খুশি হয়, ধন্যবাদ জানায়। তারপর বলে, বলুন, কি খাবেন? চা-কফি?

—না, না, চা-কফির দরকার নেই।

মিঃ আগরওয়াল একটু থেমে বলে, আমি শুধু সকালে এক কাপ চা খাই।

—উড ইউ মাইন্ড এ ড্রিঙ্ক?

—থাক, থাক, ব্যস্ত হবেন না।

ও একটু হেসে বলে, আপনি আজ প্রথম আমার বাড়িতে এসেছেন। কিছুই খাবেন না তা তো হয় না।

চৈতালী সঙ্গে সঙ্গে বলে, ইফ ইউ ড্রিঙ্ক, আই উইল গিভ ইউ কম্পানী।

—তাহলে একটু হুইস্কী নিতে পারি।

চৈতালী বেল বাজাতেই শেফালী আসে।

—আমাদের দু'জনকে হুইস্কী দাও। তবে হ্যাঁ, পুরনো বোতল থেকে দিও না। নতুন বোতল থেকে দিও।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শেফালী ট্রলি ট্রে এনে হাজির। সিভাস্ রিগ্যালের নতুন বোতল খুলে দু'জনকে হুইস্কী দেয়।

—স্যার, আপনাকে সোডা না ঠাণ্ডা জল দেব?

—সোডা।

চৈতালীর গেলাসে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দেবার পর কাজু আর পেস্তা-বাদামের দুটো প্লেট সেন্টার টেবিলে রেখে শেফালী ঘর থেকে বিদায় নেয়।

—চিয়ার্স!

—চিয়ার্স!

হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়েই চৈতালী বলে, আপনি তো শিপিং ম্যাগনেট। জাহাজের কারবারী হয়ে আমার মত সামান্য আদার ব্যাপারীর কাছে কেন এলেন?

গজাননবাবু একটু হেসে বলেন, প্রথম কথা, আমি আপনার ফ্যান।

—আপনি আমার ফ্যান?

—হ্যাঁ, ম্যাডাম, সত্যি আমি আপনার ফ্যান।

—আপনি আমার ছবি দেখেন?

—আপনার প্রত্যেকটা ছবি আমি দু'তিনবার করে দেখি।

—আশ্চর্য!

মিঃ আগরওয়াল আবার একটু হেসে বলেন, ম্যাডাম, আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? আমি তো এই কলকাতা শহরেই জন্মেছি। পড়াশুনা করেছি বালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট স্কুল আর আশুতোষ কলেজে।....

—আশুতোষ কলেজে? সেন্ট জেভিয়ার্সে না?

—আমার ইচ্ছে ছিল সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়ার কিন্তু বাবা আশুতোষ কলেজের ছাত্র ছিলেন বলে আমাকেও ঐখানেই ভর্তি করে দেন।

উনি একটু থেমে বলেন, আমার ঘনিষ্ঠ সব বন্ধুরাই তো বাঙ্গালী। যে পুলিশ কমিশনার আপনাকে ফোন করেছিল, সে আর আমি তো একই সঙ্গে আশুতোষ থেকে বি. এ. পাশ করি।

—আচ্ছা!

গজাননবাবু হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়ে বলেন, আমিও আপনাদের মত রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পড়তে সব চাইতে ভালবাসি। তার চাইতেও বড় কথা, সপ্তাহে দু'একদিন পুরনো বন্ধুদের বাড়ি যাই শুধু মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবার লোভে।

ওর কথা শুনে চৈতালী হেসে ওঠে।

হাসি থামলে ও বলে, তাহলে তো আপনাকে ইলিশ মাছ ভাজা খাওয়াতেই হয়।

—না, না, ম্যাডাম, আজ থাক। পরে একদিন......

—আজ বিকেলে গঙ্গায় ধরা ইলিশ! এত টাটকা ইলিশ তো বাজারে পাওয়া যায় না।

চৈতালী শেফালীকে তলব করে কয়েকটা ইলিশ মাছ ভাজা দিতে বলে।

এক টুকরো ইলিশ মাছ মুখে দিয়েই গজাননবাবু বলেন, সত্যি খুব সুন্দর টেস্ট।

শুরু হয় দ্বিতীয় রাউন্ড হুইস্কী।

চৈতালী বলে এবার বলুন, কি কথা বলতে এসেছেন।

—ম্যাডাম, নিছক আপনার ফ্যান হিসেবে আমি একটা ছবি করতে চাই। তবে আমি ফিল্মের ব্যবসা বুঝি না। সব দায়িত্ব আপনার।

—আমি তো শুধু অভিনয় করি। আমি কি করে সব দায়িত্ব নেব?

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তারপর ছবি যদি হিট না করে, আপনার যদি লোকসান হয়, তাহলে তো আমি বিপদে পড়ব।

—ম্যাডাম, আমি লাভ-লোকসানে ইন্টারেস্টেড না। আমি শুধু আপনার ছবি করে মনের আনন্দ পেতে চাই।

—তারপর যদি লাখ লাখ টাকা লোকসান হয়?

গজাননবাবু একটু হেসে বলেন, ম্যাডাম, আমি টাটা-বিড়লা না হলেও একটা ছবির টাকা লোকসান হলে আমার কোন অসুবিধে হবে না।

উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বলেন, কত লোক নিছক সখের জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে বাগান বাড়ি তৈরি করে, দেশ-বিদেশে বেড়াতে যায়, ছবি কেনে, বড়ে গোলাম আলি-দবীর খাঁর গানের আসর করে। আমার যদি সখ

হয়, আপনার ছবি করবো, তাহলে কি অন্যায় হবে?

চৈতালী ওর কথা শুনে অবাক হয়, খুশিও হয়।

গজাননবাবু আবার বলেন, গল্প আপনি পছন্দ করবেন, ডিরেক্টর-মিউজিক ডিরেক্টর আপনি ঠিক করবেন। মোটকথা সব কিছুই হবে আপনার পছন্দ মতো।

—শুনে লোভ লাগছে, আবার ভয়ও করছে।

—ম্যাডাম, ভয়ের তো কিছু নেই।

উনি সঙ্গে সঙ্গে ব্রীফ কেস খুলে ওর সামনে ধরে বলেন, এখানে দশ লাখ আছে। এই দিয়ে কাল থেকেই কাজ শুরু করুন। তারপর যখন যা লাগবে, আমি দিয়ে যাবে।

—প্লীজ আপনি এভাবে আমাকে টাকা দেবেন না। আমাকে একটু চিন্তা-ভাবনা করার সময় দিন।

—একটা ভাল ছবির পরিকল্পনা করতে যে সময় লাগে, তা আমি জানি। আপনি ছ'মাস-এক বছর-দু'বছর সময় নিন। তাতে আমার কোন আপত্তি বা অসুবিধে নেই ; তবে এই টাকা আমি ফেরত নেবার জন্য তো আনিনি।

চৈতালী হুইস্কীর গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলে, এইভাবে পরিচয় হবার পরই আমাদের বন্ধুত্বের শুরু হয়। মাসে-দু'মাসে গজানন আমার বাড়ি আসে। দু'চার ঘণ্টা থেকে চলে যায়।

আমি একটু হেসে বলি, শুধু তোমার কেন, গজাননবাবুরও সময় বেশ আনন্দে কাটে।

ও হাসতে হাসতে বলে, কাটে বইকি! আনন্দ না পাবার তো কারণ নেই।

—তুমি যে টয়োটা গাড়িটা চড়ো, সেটা কি তুমি কিনেছিলে নাকি....

—ওটা গজানন আমাকে দিয়েছে।

আমি হাসতে হাসতে বলি, আচ্ছা উর্বশী, তুমি কি শুধু চাকলাদার—আলুওয়ালিয়া-গজাননের মত রুই-কাতলাদেরই সান্নিধ্য পছন্দ করো? কোন সাধারণ মানুষই কি এই সৌভাগ্য লাভ করেননি?

চৈতালী চাপা হাসি হেসে বলে, কলকাতার এক বিখ্যাত কলেজের এক বিখ্যাত অধ্যাপক এই সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন।

—বিখ্যাত অধ্যাপক?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিখ্যাত অধ্যাপক।

—তাঁর সঙ্গে তোমার যোগাযোগ হলো কী করে?

ও হাসতে হাসতে বলে, উনি প্রত্যেক সপ্তাহে আমাকে একটা খুব সুন্দর প্রেমপত্র লিখতেন কিন্তু যথারীতি আমি জবাব দিতাম না। এইভাবে বছর পাঁচেক পার হবার পর...

—এই পাঁচ বছর ধরেই উনি প্রত্যেক সপ্তাহে প্রেম পত্র লিখতেন?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, পাঁচ বছরের মধ্যে একটি সপ্তাহের জন্যও উনি চিঠি লেখা বন্ধ রাখেননি।

—তারপর কী হলো?

—একটা ছবির আউট ডোর করতে গিয়েছি গ্যাংটক। সেখানে হঠাৎ ঐ প্রফেসরের সঙ্গে দেখা।

—তারপর?

—বললাম, সন্ধের পর হোটেলে আসবেন। একেবারে খাওয়া-দাওয়া করে যাবেন।

—তারপর?

—তারপর আর কি? খাওয়া-দাওয়া গল্পগুজব করতে করতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। তাই রাতটা আমার ওখানেই কাটিয়ে গেলেন।

একটু চুপ করে থাকার পর বলি, আচ্ছা উর্বশী, যে লক্ষ লক্ষ লোক তোমার ছবি দেখেন, তার পনের আনাই বোধহয় সাধারণ মধ্যবিত্ত। তাদের মধ্যে বুড়ো-বুড়ী থেকে শুরু করে পনের-ষোল বছরের ছেলেমেয়েরা আছে।

—আছেই তো।

—তাদের মধ্যেও তো অনেকে তোমাকে ভালবাসেন কিন্তু তাদের কারুর সঙ্গেই কি তোমার আলাপ-পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা হয় নি?

—দেখো বাচ্চু, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী যে আমাকে ভালবাসেন, তা আমি খুব ভাল করেই জানি। আমার খ্যাতি-যশ-অর্থ সবই তো ওদের কৃপায়।....

—নিশ্চয়ই।

—কিন্তু আমার বা চঞ্চলের মত আর্টিস্টের পক্ষে এই সব দর্শকের সঙ্গে

যোগাযোগ রাখার অনেক অসুবিধে আছে। অনেক সময় ইচ্ছে থাকলেও সম্ভব হয় না।

—হ্যাঁ, তোমাদের মত পপুলার আর্টিস্টেদের পক্ষে যেখানে সেখানে যাওয়া সত্যি অসম্ভব কিন্তু তাই বলে কি দু'পাঁচজনের সঙ্গেও তোমার বন্ধুত্ব বা হৃদ্যতা হয়নি?

—তা হয়েছে বৈকি।

চৈতালী একটু থেমে বলে, চারু এ্যাভিনুর দীপ্তি দত্ত আমার ছবি দেখার পর ফোন করবেনই। বছরের পর বছর টেলিফোনে কথা বলতে বলতেই উনি আমার দীপ্তিদি হলেন, আমি হয়ে গেলাম চৈতি।

ও চোখ দুটো বড় বড় করে বলে, দীপ্তিদির হাতের রান্না খেলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে।

—তুমি কি দীপ্তিদির চারু এ্যাভিনুর বাড়ি যাও?

—না, ও বাড়িতে যাওয়া আমার সম্ভব হয় না।

ও একটু থেমে বলে, স্টুডিও যাতায়াতের পথেই দীপ্তিদির বাড়ি কিন্তু ঐ গলির মধ্যে ঢুকতে ভয় হয়।

—হ্যাঁ, তোমাকে দেখলেই তো হাজার হাজার লোক ঘিরে ধরবে।

—ভীড় দেখে আমি ঘাবড়ে যাই না কিন্তু বেশ কিছু লোক যে অসভ্যতাও করে।

—দীপ্তিদির রান্না কোথায় খেয়েছ?

চৈতালী একটু থেমে বলে, দীপ্তিদির বাড়ি থেকে আমাদের স্টুডিওগুলো দূরে না। উনি মাঝে মাঝেই টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার দাবার স্টুডিওতে পাঠিয়ে দেন।

—দীপ্তিদির সঙ্গে তোমার কোনদিন দেখা হয়েছে?

—প্রত্যেক বছর আমার জন্মদিনের দিন সাত সকালে দীপ্তিদি কালীঘাটের প্রসাদ-নির্মাল্য আর সুন্দর একটা শাড়ি দিতে আসেন।

—প্রত্যেক বছর?

—হ্যাঁ, প্রত্যেক বছর।

ও একটু থেমে বলে, দীপ্তিদির ছেলে আনন্দর বৌভাতে আমি কখন গিয়েছিলাম জানো?

—কখন?

—রাত সাড়ে এগারোটার পর।

আমি একটু হেসে বলি, বাইরের লোকজন চলে যাবার পর?

—হ্যাঁ। তা না হলে তো আমি দীপ্তিদি বা তাঁর ছেলে-বউয়ের সঙ্গে কথা বলারই সুযোগ পেতাম না।

ও একটু হেসে বলে, তোমরা আমাকে সুন্দরী বলো কিন্তু আনন্দর বউ শুভশ্রী আমার চাইতে অনেক অনেক সুন্দরী।

শুনে আমি হাসি।

চৈতালী মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, ঠিক দীপ্তিদির মতই দমদম ক্যান্টমেন্টের মলয় চক্রবর্তীর স্ত্রী আলো আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে। আলোর মেয়ে সোমাকে আমি ঠিক নিজের মেয়ের মতই ভালবাসি। ভারী ভাল মেয়ে। তাছাড়া আলোর ছোট দেওর প্রলয় আর ওর স্ত্রী শিল্পী দু'জনেই শান্তিনিকেতনের কলাভবন থেকে পাশ করেছে। ওর দু'জনে ভারী মিশুকে। ওরা দু'জনেই তো আমার বিশেষ বন্ধু হয়ে গেছে।

—ওরা মাঝে মাঝে তোমার বাড়ি আসে?

—আলোর শাশুড়ির অনেক বয়স। তাই আলোর পক্ষে নববর্ষ আর বিজয়ার পর ছাড়া আসা সম্ভব না কিন্তু সোমাকে নিয়ে প্রলয়রা দু'এক মাস অন্তরই আসে।

ও একটু হেসে বলে, সোমার বিয়েতেও আমি প্রায় রাত বারোটার সময় গিয়েছিলাম।

—তাহলে এই ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানেও তুমি যাও?

—দীপ্তিদি বা আলোর সঙ্গে এমনই সম্পর্ক যে ওদের ছেলে-মেয়ের বিয়েতে না গিয়ে থাকতে পারিনি। তাছাড়া ঐ বিয়েতে না গেলে সোমার ঐ হ্যান্ডসাম বর অতীশকেও তো দেখতে না।

—যাক শুনে ভাল লাগলো।

—বাচ্চু, আমি অভিনেত্রী, আমি একাধিক পুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছি, আমি যথেষ্ট দাম্ভিক স্বার্থপর হলেও তো মানুষ। দীপ্তিদি বা আলো তো কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করেনি। আমি কি করে ওদের ভালবাসা, ওদের অনুরোধ উপেক্ষা করবো?

আমি একটু হেসে বলি, উর্বশী, কোন মানুষই তো ষোল আনা ভালও হয় না, ষোল আনা খারাপও হয় না।

ও একটু হেসে বলে, তাহলে স্বীকার করো, আমার মধ্যেও ছিটেফোঁটা ভাল গুণ আছে?

ছিটেফোঁটা কেন, তোমার মধ্যে যথেষ্ট ভাল গুণ আছে। তা না হলে তুমি এই খ্যাতির চূড়ায় উঠলে কি করে?

চৈতালী আবার দুটো গেলাসে হুইস্কী ঢালে, জল মেশায়, একটা করে আইস কিউব দেয়; আমার হাতে একটা গেলাস তুলে দিয়ে ও নিজের গেলাসে চুমুক দেয়। সিগারেট ধরিয়ে টান দেয়। কি যেন ভাবে আপন মনে।

আমিও কোন কথা বলি না।

হঠাৎ ও একটু হেসে বলল, বাচ্চু, আমার একটা খুব সুন্দর মেয়ে আছে।

আমি অবাক হয়ে বলি, তোমার মেয়ে?

—হ্যাঁ, আমার মেয়ে।

ও আমার দিকে স্নিগ্ধ শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, আমার মেয়েকে দেখলে তোমার মন-প্রাণ জুড়িয়ে যাবে।

—কবে তোমার মেয়ে হলো? কত বয়স হলো তোমার মেয়ের?

সেই একই ভাবে আমার দিকে তাকিয়ে ও বেশ গর্বের হাসি হেসে বলে, আমার মেয়ে এই বছরই ফার্স্ট ডিভিশনে হায়ার সেকেন্ডারী পাশ করে ইকনমিক্সে অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে।

—বলো কী?

—হ্যাঁ, বাচ্চু, সত্যি আমার মেয়ে যেমন লেখাপড়ায় ভাল, সেইরকমই স্বভাব-চরিত্র।

ওর কথাবার্তা শুনে আগ্রহ আর বিস্ময় দুইই বেড়ে যায়। বলি, আমি তোমার সিনেমা দেখার বিশেষ সময় পাই না, সুযোগও হয় না কিন্তু প্রচুর পত্রপত্রিকা পড়ি। এই সব কাগজপত্রে তোমার বিষয়ে অনেক লেখা পড়লেও তোমার মেয়ে আছে, তা তো কোথাও পড়িনি।

—আমি তো কখনও চাইনি, আমাদের মা-মেয়ের ব্যাপার দশজনের জানাজানি হোক। এটা নেহাতই আমাদের দু'জনের ব্যাপার

—তোমার মেয়ে কি উদয়ের বাড়িতেই থাকে?

—না, না, ওদের সঙ্গে আমার মেয়ের কোন সম্পর্ক নেই।

—উদয়ের সঙ্গেও তোমার মেয়ের কোন যোগাযোগ নেই?

—না।

—তোমার মেয়ে কোথায় থাকে? হস্টেলে?

চৈতালী একটু হেসে বলে, আমার মেয়ের আরো একটা মা আছে। ও তার কাছেই থাকে।

—সেখানে মেয়ের বাবাও থাকেন তো?

ও চাপা হাসি হেসে বলে, হ্যাঁ।

ও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তাহলে তোমাকে খুলেই বলি।

ঠিক সাত বছর আগেকার কথা।

'নতুন মা' ছবির আউট ডোর করতে চৈতালী গিয়েছে কাশী। তার বেশীর ভাগ শুটিং সারনাথে। পথে-ঘাটে শুটিং হলেই কিছু লোকজনের ভীড় হবেই। সারনাথও কিছু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন শুটিং দেখতে। তবে তারা নিতান্তই কৌতূহলী দর্শক। তাইতো বেশ শান্তিতেই শুটিং হচ্ছিল। তাছাড়া কিছু পুলিশ তো ছিলই।

তৃতীয় দিন শুটিং শেষ হতেই বছর দশেকের একটা মেয়ে দৌড়ে এসে চৈতালীকে প্রণাম করেই একটা কাগজ ওর হাতে দিয়ে এক গাল হাসি হেসে বলে, তোমার চিঠি। খুব পাইভেট।

চৈতালী মুখ তুলে তাকাতে না তাকাতেই মেয়েটি দৌড়ে ভীড়ের মধ্যে মিশে যায়। হোটেলে ফিরে যাবার জন্য চৈতালীও সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে ওঠে।

ও গাড়িতে বসেই চিঠিটা পড়ে।.....তিন দিন তোমাকে দেখছি। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। ইউ আর ভেরি সুইট! তোমাকে যদি আমি মা বলে ডাকি, তাহলে কি তুমি রাগ করবে?—মৌ।

চিঠিটা পড়ে চৈতালী হাসে। হঠাৎ বিচিত্র খুশিতে তার মন ভরে যায়।

হোটেলে ফিরে বার বার চিঠিটা পড়ে। আপনমনেই বলে, মৌ, অমন করে পালিয়ে গেলে কেন? আমি তো তোমার মুখখানাও ভাল করে দেখার সুযোগ পেলাম না।

চিঠিখানা হাতে নিয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে মনে মনে বলে,

জানো মৌ, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আমাকে দিদি বলে চিঠি লেখে। অনেক বুড়ো-বুড়ি আমাকে মেয়ের মতও স্নেহ করেন, চিঠি লেখেন। আরো কতজনে কত কি ভেবে আমাকে চিঠি লেখে কিন্তু তোমার মত কেউ আমাকে মা বলতে চায়নি। তোমার আগে কেউ আমাকে এই সম্মান দেয়নি।

রোজ সন্ধের পর তিন-চার পেগ হুইস্কী খেলেও সেদিন চৈতালীর হুইস্কী খেতেও ভাল লাগলো না। গেলাসে এক পেগ হুইস্কী ঢেলেছিল কিন্তু এক চুমুক দিয়েই সরিয়ে রাখলো।

হঠাৎ একটু গলা চড়িয়ে বলে, মৌ! মৌ! মৌ!

তারপর আপন মনেই হাসে। শুয়ে পড়ার পরও ঘুম আসে না। বেড সাইড ল্যাম্প জ্বালিয়ে আবার চিঠিটা কয়েকবার পড়ে। বলে, মৌ, কি সুন্দর তোমার হাতের লেখা।

আবার বলে, আমি সুইট? কিন্তু আমার তো মনে হয়, তুমি আমার চাইতেও সুইট।

বার বার হাতের ঘড়ি দেখে। কখন যে রাত্রি শেষ হবে?

চৈতালী যেন আর ধৈর্য ধরতে পারে না।

পরের দিন চৈতালী গাড়ি থেকে নামাতেই মৌ ছুটে এসে প্রণাম করে বলে, তুমি আমার চিঠিটা পড়েছিলে?

চৈতালী নীচু হয়ে ওকে দু'হাত দিয়ে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে কানে কানে ফিস ফিস করে বলে, মা মেয়ের চিঠি পড়বে না, তাই কখনো হয়?

মৌ এক গাল হেসে বলে, আমি জানতাম, তুমি আমার রিকোয়েস্ট ফেলতে পারবে না।

চৈতালী হেসে বলে, আমিও জানতাম, আমার মেয়ে সাবনাথে এসেছে। তাইতো আমি এখানে এলাম।

চৈতালী আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে, সেদিন শুটিং-এর পর আমি মৌকে নিয়েই হোটেলে ফিরলাম।

—মৌ কার সঙ্গে ওখানে গিয়েছিল?

—মা-বাবার সঙ্গে।

—তাদের সঙ্গেও তোমার আলাপ হয়েছিল?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, ওঁরা অনুমতি দিলেন বলেই তো মৌকে নিয়ে এলাম।

—ওর বাবা কি করেন?

—ওর বাবা টাটা স্টীলে সাধারণ কেরানীর চাকরি করলেও বেশ পড়শুনো করা মানুষ। মৌ'এর মা মণিকাদি তো এমনই সাদাসিধে মহিলা যে দেখে মনেই হবে না, বিয়ের পর বাড়িতে বসে পড়াশুনা করেই ভদ্রমহিলা বি.এ.-এম.এ পাশ করেছেন।

—ওঁরা কোথায় থাকেন?

—সিঁথিতে।

ও একটু থেমে বলে, যেদিন প্রথম মৌকে নিয়ে আসি, সেদিন আমরা দু'জনে রাত তিনটে পর্যন্ত গল্প করেছিলাম।

—ঐ একদিনই মৌ তোমার কাছে ছিল?

—না। পর পর চার রাত ও আমার কাছে ছিল।

—তারপর?

—আর বলো না।

চৈতালী হাসতে হাসতে বলে, মৌ কিছুতেই আমাকে কলকাতা ফিরতে দিলো না। ওদের সঙ্গে আমাকেও লক্ষ্ণৌ যেতে হলো।

আমি একটু হেসে বলি, তাই নাকি?

—হ্যাঁ।

ও একটু থেমে বলে, কলকাতায় তিন-চারটে ট্রাংকল করে শুটিং এর তারিখ কোনমতে অদল-বদল করে ওদের সঙ্গে তিন দিন কাটিয়ে কলকাতায় ফিরি।

—ওরাও কি তোমার সঙ্গে কলকাতা ফিরলেন?

—না, ওঁরা গেলেন দিল্লী।

একটু থেমে প্রশ্ন কর, লক্ষ্ণৌতে ঐ তিন দিন কেমন কেটেছিল?

—অসম্ভব ভাল।

ও একটু থেমে বলে, তুমি ভাবতে পারবে না, ঐ তিন দিন কি আনন্দে কাটিয়েছি।

—খুব ঘুরে বেড়িয়েছিলে?

—এক কথায় বলা যাবে না।

চৈতালী হুইস্কীর গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, 'নতুন মা' ছবির প্রযোজক অরবিন্দবাবু ফিল্ম লাইনের বিখ্যাত লোক। ওঁর সাত-আটটা ছবিতে আমি নায়িকা হয়েছি। প্রত্যেকটা ছবি থেকেই উনি প্রচুর লাভ করেছেন। তাইতো উনি আমাকে মা লক্ষ্মী বলে ডাকেন।

—অরবিন্দবাবু কি বয়স্ক মানুষ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। যখনকার কথা বলছি, তখন ওর বয়স ষাট-বাষট্টি হবে।

ও একটু থেমে বলে, ভাগ্যক্রমে উনিও আমাদের সঙ্গে কাশী এসেছিলেন। ওকে লক্ষ্ণৌ যাবার কথা বলতেই উনি আমাদের চারজনের ফাস্ট এ-সি'র টিকিট-রিজার্ভেশন করে দেওয়া ছাড়াও আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, ওখানকার বিখ্যাত ডিস্ট্রিবিউটার কাশেম চৌধুরী আমার বিশেষ বন্ধু। সে আপনাদের সব ব্যবস্থা করে দেবে। আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।

—উঠেছিলে কোথায়?

—কার্লটনে।

ও একটু থেমে বলে, কাশেম চৌধুরী নিজে আমাদের স্টেশনে রিসিভ করে হোটেলে নিয়ে গেলেন। আমাদের জন্য একটা গাড়িও রেখে গেলেন। ঐ ভদ্রলোক যে আমাদের জন্য কি করেছেন, তা বলে শেষ করা যাবে না।

—তুমি মৌ' এর কথা বলো।

চৈতালী হাসতে হাসতে বলে, আমি আর মৌ তো আধিকাংশ সময়ই শুধু গল্প করেছি।

—ওঁর বাবা-মা?

—মৌ সকাল-বিকেল ওদের গাড়িতে তুলে দিয়ে বলতো, যাও, যাও, তোমরা বেড়াতে যাও। আমি আর মা হোটেলেই বেশ আছি।

ও একটু থেমে বলে, মণিকাদি আর দাদা বেড়িয়ে আসার পর আমরা চুটিয়ে আড্ডা দিতাম। তারপর আমরা হজরতগঞ্জে গিয়ে .-টি পুরে চাট আর কুলফি খেতাম।

—তুমি আর মৌ কি লক্ষ্ণৌ'র কিছুই দেখতে যাওনি?

—হ্যাঁ, একদিন আমরা বড় ইমামবাড়া, ভুলভুলাইয়া, জুমা মসজিদ, রেসিডেন্সী ও আরো অনেক কিছু দেখেছিলাম।

—মৌ'এর সঙ্গে এত কি গল্প করতে?

—আকাশ-পাতাল কত কি নিয়ে আমরা বক বক করেছি। সব কথা কি এখন মনে আছে?

—যা মনে আছে, তাই বলো।

মৌ চৈতালীর কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে শুয়ে বলে, জানো মা, তোমাকে প্রথম দেখেই মনে হয়েছিল, ছুটে গিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করি।

চৈতালী ওর মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ে বলে, কেন?

—তোমাকে দারুণ ভাল লেগেছিল।

মৌ মুহূর্তের জন্য থেমে একটু হেসে বলে, যাকে বলে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট।

চৈতালী ওর কপালে একটা চুমু খেয়ে বলে, পাগলী কোথাকার।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, আমাকে মাসীমা-পিসীমা না বলে মা বলে ডাকতে ইচ্ছে করলো কেন?

—তোমাকে মা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারলাম না।

মৌ দু'হাত দিয়ে চৈতালীর মুখখানা ধরে বলে, তুমি এত সুইট যে তোমাকে মাসীমা-পিসীমা বলে ডাকাই যায় না।

—তুই যে চিঠিটা আমাকে দিয়েছিলি, তা মণিকা'দ বা দাদা দেখেছিলেন?

—হ্যাঁ। বাবা চিঠিটা দেখে শুধু একটু হাসলো। মা বললেন, উনি তো সব সময়ই ব্যস্ত থাকেন। তোর চিঠি পড়ার কি সময় পাবেন?

চৈতালী মৌ'এর মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে, আমি তোর চিঠিটা যে কত বার পড়েছি, তার ঠিক ঠিকানা নেই।

—চিঠিটা পড়ে তোমার কি মনে হলো?

—মনে হলো, এখনই ছুটে গিয়ে তোকে আদর করি।

মৌ দু'হাত দিয়ে ওর গলা জড়িয়ে ওঁর দু'গালে চুমু খেয়ে বলে, ইউ আর এ লাভলি মাদার।

—তুইও তো [illegible]!

হজরতগঞ্জ থেকে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয় কিন্তু তবু ওদের দু'জনের চোখে ঘুম আসে না। দু'জনে গলা জড়াজড়ি করে মুখোমুখি শুয়ে কত কথা হয়।

—আচ্ছা মৌ, আমি তো সিনেমা করি। কত লোক তো আমাদের পছন্দ করে না। তবু আমাকে তোর মা মনে হলো কেন?

কিশোরী মৌ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, তুমি সিনেমা করো বা হাউজ ওয়াইফ, যাই হও না কেন, তাতে আমার কি?

ও সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে, আমাকে কি তোমার মেয়ে মনে হয়নি?

—একশ'বার মনে হয়েছে।

চৈতালী মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, তুই গত জন্মেও আমার মেয়ে ছিলি, সামনের জন্মেও আমার মেয়ে থাকবি।

ও আবার একটু পরে বলে; তবে মনিকাদি আর দাদার প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ।

—কেন?

—তাঁরা আপত্তি করলে কি তোকে আমি এভাবে পেতাম?

মৌ একটু হেসে বলে, ওরা দু'জনেও ঠিক তোমারই মত ভাল। বলো মা, আমি কি লাকী না?

—তুই যেমন লাকী, সেইরকম তোর মত মেয়ে পেয়ে আমরা তিনজনেই লাকী।

কলকাতায় রওনা হবার আগের দিন রাত্রে চৈতালী মেয়েকে আদর করতে করতে বলে, মৌ, কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমাকে ভুলে যাবি না তো?

—আচ্ছা মা, তুমি কি পাগল হয়েছ? কোন ছেলেমেয়ে কি মাকে ভুলতে পারে নাকি মা ছেলেমেয়েকে ভুলতে পারে?

আমি একটু হেসে জিজ্ঞেস করি, কলকাতায় তোমাদের রেগুলার দেখাশুনা হয়?

—সেই তখন থেকেই ও মাসে এক রবিবার আমার কাছে থাকে। যেদিন

মৌ আসে, সেদিন আমার বাড়িতে কোন বাইরের লোককে আসতে দিই না।

—তুমি নিশ্চয়ই মেয়েকে অনেক কিছু কিনে-টিনে দাও।

—পুজো আর জন্মদিনে নিশ্চয়ই কিছু উপহার দিই। তাছাড়া আমি শুধু বই কিনে দিই।

চৈতালী একটু থেমে বলে, মৌকে একটা কথা বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছি যে কেউ কোন দিন যেন বলতে না পারে আমার জন্য ও ভালভাবে পড়াশুনা করেনি বা স্বভাব-চরিত্র খারাপ হয়েছে।

—সে কথা শুনে মৌ কি বলেছিল?

—বলেছিল, মা, আমি কোনদিন এমন কোন কাজ করবো না যাতে তোমাকে কেউ দোষ দিতে পারে।

ও একটু হেসে বলে, ঈশ্বরের কৃপায় আমার মেয়েটা সত্যি ভাল হয়ছে। ভগবান ঠিক সময়েই ওকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন।

চৈতালী আবাব দুটো গেলাসে হুইস্কী ঢালে। দু'জনেই গেলাসে চুমুক দিই। দু'জনের কেউই কোন কথা বলতে পারি না।

দশ-পনের মিনিট পর আমি জিজ্ঞেস করি, তোমার অপুদার কি খবর?

—ভালই।

মুহূর্তেব জন্য থেমে বলে, জীবনে অনেক পুরুষকে দেখলাম কিন্তু অপুদা ছাড়া কেউ আমাকে ভালবাসে নি। তাইতো কলেজের ছুটিতে ও যখন আসে, তখন আর ওকে ছাড়তে ইচ্ছে করে না।

—অপুদাকে বিয়ে করলে না কেন?

—তা আর হয় না।

চৈতালী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এখন মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানো?

—কি মনে হয়?

—মনে হয়, যদি উদয়ের বদলে অপুদার সঙ্গে আমার বিয়ে হতো, তাহলে বোধ হয় সুখী হতাম। ওর মত অধ্যাপকের স্ত্রী হয়ে জীবন কাটাতে পারলে বেশ ভালই থাকতাম।

আমি একটু হেসে বলি, অপুদার স্ত্রী হলে তো এই খ্যাতি-যশ-অর্থ-

প্রতিপত্তি হতো না।

—কিন্তু রাচ্চু, এত খ্যাতি-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তি পেয়েও তো মন ভরলো না, শান্তি পেলাম না।

—এতগুলো পুরুষকে ঠকিয়ে, তাদের সর্বনাশ করেও মন ভরলো না?

ও ঠোঁটের কোণে একটু হাসির রেখা ফুটিয়ে বলে, দেখো বাচ্চু, তোমাকে একটা অপ্রিয় সত্যি কথা বলে দিই। কোন মেয়েই কোন পুরুষের সর্বনাশ করে না। তোমরা পুরুষরাই মেয়েদের সর্বনাশ করো।

ও একটু থেমে বলে, তবে জেনে রেখে দিও, সব মেয়েদের মধ্যেই একটা আগুন লুকিয়ে থাকে। পুরুষরা তাদের সর্বনাশ করলে ঐ আগুনে পুরুষদেরই অনেক কিছু পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে বাধ্য।

চৈতালী হুইস্কী খেতে খেতে কোথায় যেন তলিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর বলে, হাতে গোটা তিনেক ছবি আছে। মনে মনে ঠিক করেছি, ঐ তিনটে ছবির কাজ শেষ হবার পর আর অভিনয় করবো না।

—সেকি? এখনও তো তোমার প্রচুর ডিমান্ড।

—না বাচ্চু, সত্যি আর অভিনয় করবো না।

— কিন্তু কেন?

ও একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, আর ইচ্ছে করছে না।

—কেন ইচ্ছে করছে না, সেটা তো বলবে।

ও আমার চোখের উপর চোখ রেখে বলে, মৌ বেশ বড় হয়েছে। এখন ঐ একঘেয়ে প্রেমের অভিনয় করতে সত্যি লজ্জা করে।

—নায়িকা না হলেও অন্য রোল তো করতে পারো।

—না, না, ও আমার দ্বারা হবে না।

ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে, শুরু করেছিলাম হিরোইন হয়ে, শেষও করবো হিরোইন হিসেবে। মা-মাসী-দিদির রোল করে আমি টিকে থাকতে চাই না।

—অভিনয় ছেড়ে দিয়ে কি করবে?

ও এক গাল হাসি হেসে বলে, মনে মনে ভেবেছি, মৌ বি.এ. পাশ করার পর পরই একটা ভাল ছেলের সঙ্গে ওর বিয়ে দেব।

—তারপর?

—যদি মেয়ে-জামাই আপত্তি না করে, তাহলে ওদের কাছেই থাকব। তারপর নাতি-নাতনী হলে তো তাদের নিয়েই আমার দিন মহানন্দে কেটে যাবে।

—মণিকাদি আর তোমার দাদারও ঐ একমাত্র সন্তান। ওরাও যদি মেয়ে-জামাইয়ের কাছে থাকতে চান?

—নিশ্চয়ই থাকবেন।

ও একটু হেসে বলে, আমি এত লোভী না যে ওদের অধিকার কেড়ে নেব।

—কিন্তু যদি কোন কারণে মেয়ে-জামাইয়ের কাছে থাকা সম্ভব না হয়?

সঙ্গে সঙ্গেই আবার বলি, আজকাল বিয়ের পর তো বহু মেয়েকেই কানাডা-আমেরিকায় গিয়ে স্বামীর ঘর করতে হচ্ছে। মৌও বিয়ের পর বাইরে চলে যেতে পারে।

—পারে বৈকি।

—তাছাড়া বারো মাস মেয়ে-জামাইয়ের কাছে থাকাও তো ভাল না।

চৈতালী এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, সবই জানি, সবই বুঝি।

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমি খুব ভাল করেই জানি, মানুষ যা চায়, তা অধিকাংশ মানুষই পায় না ; আবার যা পায় তা চায় না। আমার বেলাতেও তাই হবে না, তা কে বলতে পারে?

—তাহলে কি করবে?

—ঠিক জানি না।

ও একটু থেমে বলে, হয়তো মাইশোরের মত কোন শান্তিপূর্ণ জায়গায় চলে যাবো। আবার ভীমতাল-সাততালেও একটা ছোট্ট বাড়ি তৈরি করে থাকতে পারি।

—একলা একলা থাকতে পারবে? তাছাড়া..

ওকে একটু হাসতে দেখেই আমি থামি।

—থামলে কেন? যা বলতে চাও, বলো।

—আলিপুরের ঐ প্রাসাদ, এত দাস-দাসী, এতগুলো গাড়ি, এত স্তাবক মোসাহেব কৃপাপ্রার্থী—সব ছেড়ে থাকতে পারবে?

চৈতালী একটু হেসে বলে, বাচ্চু, আমি তোমার মত লেখাপড়া করিনি;

আমি দার্শনিকও না। তবুও এই সামান্য জীবনে যেটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার দ্বারা বুঝেছি, কোন মানুষেরই জীবন চিরকাল একভাবে চলতে পারে না। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে বদলাতেই হয়। কেউ সে পরিবর্তন হাসি মুখে মেনে নেয়. কেউ তা পারে না।

ও একটু থেমে বলে, হ্যাঁ, আমি আলিপুরের বিশাল বাড়িতে থাকি, আমার অনেক কাজের লোক, বেশ কয়েকটা গাড়ি, মোসাহেব, স্তাবক সবই আছে কিন্তু বিশ্বাস করো, এখন মোহ নেশা আমার কেটে গেছে।

—কেউ কি এই মোহ থেকে মুক্তি পায়? তাছাড়া তুমি তো মা সারদা না।

—না, আমি নিশ্চয়ই মা সারদা না।

ও একবার নিঃশ্বাস নিয়ে বলে, অন্যদের কথা বলতে পারবো না, তবে আমার মোহ নেই।

—মোহ নেই মানে? কোনদিনই ছিল না?

—ঠিক মোহ বলতে আর পাঁচজনে যা বোঝে, তা আমার কোনকালেই ছিল না। আমি কিছু মানুষকে দেখাতে চেয়েছিলাম, আমি কোথায় উঠতে পারি, কত কি অর্জন করতে পারি।

—কিছু মানুষ মানে? উদয় বা তার মা?

—হ্যাঁ। নিশ্চয়ই।

চৈতালীর চোখ দুটো যেন আগুনের গোলার মত জ্বলে ওঠে। বলে, উদয়ের অপমান-অত্যাচার, শাশুড়ির তাচ্ছিল্য আর হরিবাবুর অত্যাচারের জবাব দেবার জন্যই তো আমাকে এত কিছু করতে হয়েছে। কিন্তু এখন এসবের আর কোন প্রয়োজন নেই।

ও একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে. জানো বাচ্চু, আমার কি দুঃখ?

—তোমার আবার কি দুঃখ?

—পৃথিবীর কোটি কোটি মেয়ে মনের মত স্বামী, মায়ের মত শাশুড়ি, পিতৃতুল্য স্নেহশীল শ্বশুর বা দু'একটা সুন্দর ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করে যে আনন্দ, যে শান্তি পায়, তা আমার কপালে কেন জুটলো না বলতে পারো?

ও একটু ম্লান হাসি হেসে বলে, আমি যে কত দুঃখে গেলাস গেলাস হুইস্কী খাই, তা তুমি বুঝবে না।

এ সংসারে নিরন্ন চায় দু'মুঠো অন্ন, নিরাবরণ প্রার্থনা করে এক টুকরো বস্ত্রের, রিক্ত নিঃস্ব স্বপ্ন দেখে কিছু অর্থের, আশ্রয়হীন প্রত্যাশা করে একটু আশ্রয়ের। এ ছাড়া উপেক্ষিত চায় সম্মান, লাঞ্ছিত চায় অত্যাচারীর শাস্তি, নিঃসন্তান দম্পতি আকুতি-মিনতি করে একটি সন্তানের জন্য।

মানুষ আরো আরো কত কি আশা করে। কেউ চায় রূপ, কেউ চায় খ্যাতি-যশ, কেউ চায় রোগমুক্তি, আবার কেউ চায় গৃহত্যাগীর প্রত্যাবর্তন।

চৈতালী যা পেয়েছে, যা অর্জন করেছে, তা ক'জন মানুষের অদৃষ্টে জোটে? তবুও সে সুখী না? খুশি না?

এ সংসারে কি কেউই সুখী না? সবাই অতৃপ্ত?

আমি ওর হাত থেকে হুইস্কীর গেলাসটা নামিয়ে রেখে দু'হাত দিয়ে মুখখানা ধরে বললাম, উর্বশী, পাওয়া না-পাওয়ার সঙ্গে তো সুখ-দুঃখের সম্পর্ক নেই। সুখ-দুঃখ তো মনের ব্যাপার। তুমি যদি মনে করো সুখী, তাহলে দুঃখ তোমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

আমি ওর দু'চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে একটু হেসে বলি, যদি পারো অন্যের চোখের জল দূর কোরো। দেখবে তোমাকে কোনদিন চোখের জল ফেলতে হবে না।

চৈতালী অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আমার দুটি হাত ধরে বলে, বাচ্চু, মৌ আমাকে ভুলে যাবে না তো? ও আমাকে কোন দুঃখ দেবে না তো?

আমি মাথা নেড়ে বলি, যদি তুমি সত্যি ওকে সন্তান জ্ঞানে মাতৃস্নেহ দাও, তাহলে ও কোনদিন তোমাকে দুঃখ দিতে পারবে না।

ও হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, তুমি বিশ্বাস করো, আমি ওর জন্য বুক চিরে রক্ত দিতে পারি, প্রাণ দিতে পারি।

আমি একটু হেসে বলি, তাহলে মৌ-ও তোমার জন্য হাসিমুখে সর্বস্ব দিতে পারবে।

হঠাৎ কালো মেঘের পাশ থেকে সূর্যের আলো ঠিকরে পড়ার মত চৈতালীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলে, আমি জানি, মৌ আমার সব দুঃখ দূর করে দেবে।

এই স্বপ্নের নেশায় চৈতালী মাতাল হয়ে আছে।